সিঙ্গুরের স্বর্গীয় জমিদার

দ্বারিকানাথ বাবু

তাঁহার বংশাবলীর জীবনচরিত।

শ্রীপ্রমথনাথ বর্ম্ম প্রণীত।

কলিকাতা,

১২/৯ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
আংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেসে,
শ্রীদীননাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যা পরম পূজনীয়া

শ্রীশ্রীমতী বর্দ্ধমানেশ্বরী মহারাণী রাজরাণী

রাজমাতা নারায়ণ কুমারী দেবী ঠাকুরাণী

অসংখ্য দীন-দরিদ্র-কুল-প্রতিপালকেষু।

মা।

বর্দ্ধমানাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ অধিরাজ মহতাপ চন্দ্‌ বাহাদুরের কৃতোপকার স্মরণ করিলে ও আপনার অসামান্য বদান্যতার বিষয় অবগত হইলে, হৃদয় সততই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। সেই ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ আমি এই ক্ষুদ্র জীবনচরিত খানি, ঐকান্তিক যত্ন ও বিহিত বিনয় সহকারে, প্রীতি-প্রণব-চিত্তে, আপনার শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করিলাম। ভরসা করি, অন্ততঃ আমার প্রথম উদ্যম বলিয়াও, আপনি ইহার প্রতি অণুমাত্র স্নেহ প্রদর্শনে বঞ্চিত করিবেন না। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সিঙ্গুর।
১৫ই আষাঢ়, ১২৯৪ সাল।

শ্রীপ্রমথনাথ বর্ম্মণঃ।

সিঙ্গুরের স্বর্গীয় জমিদার

দ্বারিকানাথ বাবু

ও

তাঁহার বংশাবলীর জীবনচরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

" The Keytrie's pride—the Brahmin's god—
Shall both be trampled and o'er thrown ?
And the pure land your footsteps trod,
Stoop to a race to you unknown ;
And will ye sleep, for ever sleep,
While good men pray, and brave one's weep
And native honour's latest gasp,
Is ebbing in the oppressor's grasp ? "

(W. F. Thompson.)

ভারতের দিগন্তব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব (Revolution) নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। ঘোর ঘনান্ধকারময় ভারতগগণে, সবে মাত্র অল্প অল্প নব সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইতেছে। যবনরাজের দারুণ অত্যাচার, কালের কঠোর শাসনে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতরাজ্যের হেমদণ্ড, ইংরাজ কর-কবলিত হইয়া নূতনতর

শ্রীধারণ করিয়াছে। ঈদৃশ ঘোরতর মহাপ্রলয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনের সময়, "দ্বারিকানাথ সাহি" নামে জনৈক ক্ষত্রিয় বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। যাঁহার শ্রুতিমধুর মনোহর নাম, একদিন তদ্দেশস্থ প্রত্যেক আবালবৃদ্ধ বনিতার হৃদয়-তন্ত্রিকে আঘাত করিয়াছিল, যে ভাগ্যবান পুরুষের অদৃষ্ট-চক্রের অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া, একদিন বঙ্গবাসী মাত্রেই স্তম্ভিত হইয়াছিল, যাঁহার অলৌকিক রূপ, অসাধারণ অধ্যবসায়, অসামান্য ধীশক্তি, অপরিমিত সহিষ্ণুতা এবং অমানুষিক ক্ষমতার বিষয় একদিন বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তাঁহারই জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অদ্য আমরা কৃত-সংকল্প হইয়াছি। তবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে রাজা নাই, রাজসূয় নাই, পারিজাত কুসুম নাই, কৌস্তুভ মণি নাই, কিম্বা ভাষার প্রাঞ্জলতা, রচনার পরিপাটিতা, অথবা কাল্পনিক উপকথার নাম মাত্র নাই। কেবল একজন নিঃস্ব ক্ষত্রিয় যুবকের জীবনী মাত্র অবলম্বন করিয়া জনসমাজে পরিচিত হইতে অগ্রসর। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা কি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির আদ্যন্ত শ্রবণ করিবেন?

পঞ্জাব প্রদেশের "সেরিণগাঁও" নামক কোন ক্ষুদ্র পল্লিতে দ্বারিকানাথের পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের তাদৃশ সঙ্গতি না থাকায়, তাঁহার পিতা গোপীনাথ সাহি, সামান্য ব্যবসা বানিজ্য অবলম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে আসিতেন, এবং সেই উপলক্ষে পরিচিত হইয়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর গ্রামে, "মহাতা বাবু-দিগের" বাটীতে দারপরিগ্রহ করেন। তৎকালে, মহাতা

বাবুরা এদেশের মধ্যে গণ্য, মান্য, ধনাঢ্য এবং বল বীর্য্য-শালী লোক ছিলেন। বিশেষতঃ, দেশ উত্তমরূপে সুশাসিত না থাকায়, "দস্যু" এবং "বর্গীর" অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। সেই সময়, "নবাব সরকার" হইতে মহাত্মা বাবুদিগের উপর, দেশের শান্তিরক্ষার ভার ও "থান্‌দার" উপাধি প্রদত্ত হয়। অদ্যাবধি তাঁহাদের ভদ্রাসন, "থানদার বাবুদিগের ভিটা" বলিয়া বিখ্যাত আছে।

গোপীনাথের বিবাহের অব্যবহিত পরেই কাশীনাথ ও দ্বারিকানাথ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাহা-দের জন্মস্থান কোথায়, সঠিক জানা যায় না। কেহ বলেন "বাঙ্গালায়", কেহ বলেন "হিন্দুস্থানে"। ফলতঃ, শৈশব-কালেই তাঁহারা পিতৃহীন হওযায়, অগত্যা সিঙ্গুরে মাতামহা-শ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তাঁহাদের দীন জননী * অতি কষ্টে পিত্রালয়ে থাকিয়া, অপোগণ্ডদ্বয়কে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। কাশীনাথ, অবস্থার বিপর্য্যয় হেতু, অল্প বয়সেই সংসারানুরাগ শূন্য হইয়া, তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হয়েন; তদবধি আর প্রত্যাগমন করেন নাই। কিম্বদন্তী দ্বারা প্রকাশ পায় যে, তিনি "পুষ্কর তীর্থে" জীবন বিসর্জ্জন করেন।

* ইহাঁর নাম হরিপ্রিয়া দেবী ছিল। কথিত আছে, যে ইনি প্রত্যহ লক্ষ "হরিনাম" জপ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া-বধি, অন্ন আহার ত্যাগ করিয়া, সামান্য ফল মূলাদির দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন।

দ্বারিকানাথ বাল্যকালাবধি অত্যন্ত সুচতুর এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। বিদ্যা চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হইত। কিন্তু তৎকালে এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথা আদৌ প্রচলিত না থাকায়, দেশীয় পাঠশালায় এবং "মুক্তার খানায" কথঞ্চিৎ বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

জন্মাবধি কষ্ট সহিযা সহিযা দ্বারিকানাথ এক দিনের তরেও নিজের জন্য কাতর হইতেন না। তবে সেই অনাথিনী মাতার চক্ষের জল দেখিলে, তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইত; তখন বালক, "খেলাধুলা" ভুলিযা গিযা, আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া, মাতার দুঃখে দুঃখিত হওতঃ, তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইযা ক্রন্দন করিতেন। আবার যখন মাতা সেই বিষাদাশ্রু মোচন করিয়া, স্নেহভরে আদর করিযা, দ্বারিকানাথ বলিয়া ডাকিতেন, তখন তিনি শোক, তাপ, ক্লেশ ও দুঃখ সকলই বিস্মৃত হইতেন। নব বলে উৎসাহিত হইয়া ঘর, দ্বার, গৃহ, প্রাঙ্গন, আলোড়িত করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেন। এইরূপে দুঃখিনী মাতাও ইহ সংসারের একমাত্র অবলম্বন সেই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে কষ্টের দিন এক একটী করিয়া অতিবাহিত করিতেন।

দ্বারিকানাথ শিষ্ট শান্ত এবং সচ্চরিত্র ছিলেন। দৈহিক লাবণ্যেরও অপ্রতুল ছিল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বিশেষতঃ, তাঁহার মাতুলের অপর সন্তান সন্ততি না থাকায়, দ্বারিকানাথকেই তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে সময়ে সময়ে বিষয় কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। বালক দ্বারিকানাথও মাতুলের

আদিষ্ট বিষয়কার্য্য যথাসাধ্য নির্ব্বাহ করিযা, অল্প বয়সেই কতকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইযাছিলেন। এই-রূপে, কখন বিদ্যাশিক্ষায, কখন বাল্য ক্রীড়ায, কখন বা বিষয কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিযা, মাতুলের গৃহে এবং মাতার স্নেহে পরিপুষ্ট হওতঃ শুক্ল পক্ষের শশধরের ন্যায় দ্বারিকানাথ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"I had a dream, which was not all a dream."

(*Byron.*)

এখন হইতে দ্বারিকানাথের মার্জ্জিত বাল্য-বুদ্ধির কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল। শৈশব সহচরগণের সহিত যখন তিনি কথাবার্ত্তা কহিতেন, তখনও তাঁহার প্রত্যেক কথায যেন কোন গূঢ়তর অর্থ নিহিত থাকিত। সঙ্গিগণের মধ্যে দ্বারিকানাথকে প্রাযই তাহাদের দলের নেতা হইয়া দক্ষতার সহিত তাহাদের উপর স্বীয প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যাইত। গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান বালক আর দৃষ্টিগোচর হইত না। এমন কি, অনেকানেক পাড়া প্রতিবাসী তাঁহাদের সন্তানগণকে ভর্ৎসনা করিবার সময়, দ্বারিকানাথের চরিত্র অনুকরণ করিতে বলিতেন এবং কথায় কথায় তাঁহার দৃষ্টান্ত দিয়া নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন।

দ্বারিকানাথ ছেলেবেলা হইতেই মিষ্টভাষী এবং সদ্বক্তা ছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইতেন। অহঙ্কার, মাৎসর্য্য কাহাকে বলে, দ্বারিকানাথ আদৌ জানিতেন না, এবং পরিশ্রম করিতে কখন কাতর হইতেন না। ফলতঃ, দ্বারিকানাথ সেই অল্প বয়সেই সকলের দৃষ্টান্ত ও লক্ষ্যস্থল হইয়া, সেই সামান্য বীজে যে একটী বৃহৎ মহীরুহ নিহিত আছে, তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে দ্বারিকানাথ কতিপয় মাত্র বন্ধু সমভিব্যাহারে নিকটস্থ পল্লি মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তখন পশ্চিমাকাশে সূর্য্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি মিশাইয়া গিয়াছিল; তাহাতে আবার অন্ধকারময়ী অমা তিথি। সূর্য্যাস্তের পর হইতেই ঘোর বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছিল। নৈশগগণের স্থানে স্থানে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিতেছিল। সেই সময়ে, সেই বসতি শূন্য পল্লিমধ্যে, * একটী বহুকালের পুরাতন, বহুদূর বিস্তৃত ও বৃহদাকার বটবৃক্ষ মূলে কেবল কয়েকজন সন্ন্যাসী বসিয়া, বেদগান এবং শংখ্যধ্বনি দ্বারা সায়ংকালীন মঙ্গলাচরণ করিতেছিলেন। তৎকালে এতদ্দেশে অপর কোন পান্থশালা না থাকায়, অধিকাংশ তীর্থযাত্রীগণই ঐ নির্জ্জন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

বৃক্ষমূলে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীগণ আপনাপন ইষ্ট চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন। প্রকৃতি তখনও শব্দময়ী। শিবাগণের বিকট চীৎকারে এবং বালকগণের কলরবে কাণ "ঝালাপালা" করিতেছিল। ইহাতে উত্যক্ত

* ঐ স্থানটী অদ্যাবধি সন্ন্যাসীডাঙ্গা বলিয়া খ্যাত আছে।

হইযা, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, শব্দ লক্ষ্য পূর্ব্বক বালকগণেব পশ্চাৎ অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাব বলিষ্ঠ গঠন, সুদীর্ঘ জটাভাব, এবং আবক্ষবিস্তৃত শ্বেত শ্মশ্রুজাল দেখিযা, বালকগণ যে, যে দিকে পাইল, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটীয়া পলাইল, কিন্তু নির্ভীক দ্বাবিকানাথ তাহাতে অণুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত না হইযা অবলীলাক্রমে দাঁড়াইযা বহিলেন। সন্ন্যাসী বালকেব ঈদৃশ সাহস দৃষ্টে প্রীত হইযা, যত্ন সহকাবে বৃক্ষমূলে আহ্বান কবতঃ, অন্যেব অশ্রাব্য ভাবে অনেকক্ষণ কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীব মনেব কথা সন্ন্যাসীই জানিতেন ; ফলতঃ, বিদায় কালে যখন প্রণাম কবিযা দ্বাবিকানাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সেই সমযে কাষ্ঠস্থিত অগ্নি একবাব সতেজে প্রজ্জলিত হইযা উঠিল। সুযোগ বুঝিযা সন্ন্যাসী তাঁহাব আপাদমস্তক নিবীক্ষণ কবিযা লইলেন।

প্রতিদিন যাহা কিছু ঘটিত, দ্বাবিকানাথ বাটী আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহা মাতৃগোচব কবিতেন। কিন্তু সে দিনেব ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ কবিলেন না। তাঁহার সঙ্গীগণ আবাব সেই সন্ন্যাসীব কথা উত্থাপন কবিয়া কত কি পবিহাস কবিতে লাগিল, তাহাবও কোন উত্তব দিলেন না। তাঁহাব আসিতে বিলম্ব দেখিয়া দুঃখিনী মাতা কতই অশুভ আশঙ্কা কবিতেছিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা কবায় দ্বারিকানাথ চুপ করিয়া বহিলেন। অত্যন্ত পেড়াপিড়ি কবাতে পাঁচটা পাঁশ কথা উত্থাপন কবিয়া আসল কথা গোলমাল করিয়া দিলেন। মা ইহাব নিগূঢ় রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, এবং ছেলেও তাহা প্রকাশ করিলেন না।

এইরূপে তখন সে কথা নিষ্পন্ন হইয়া গেল। দ্বারিকানাথও আহারান্তে শয়ন করিতে গেলেন। রাত্রি যখন সবে মাত্র অর্দ্ধ যাম অতীত হইয়াছে, সমগ্র জগৎ সুসুপ্ত, সেই সময় সেই ঘোরান্ধকারময়ী রজনীতে, দ্বারিকানাথ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া, নিঃশব্দে গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, এবং বন, জঙ্গল, নদী, নালা অতিক্রম করিয়া, সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে তখনও অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিবামাত্র, কোন কথা না বলিয়া, বিকট চীৎকারধ্বনি করতঃ সহসা তাঁহার পৃষ্ঠে সজোরে তিনবার চপেটাঘাত করিলেন। সে চীৎকার শব্দে দ্বারিকানাথ শিহরিয়া উঠিলেন। সে আঘাতে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং আতঙ্কে একটী মাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, ছিন্নদাম পত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে, দ্বারিকানাথ ভূতলশায়ী এবং মূর্চ্ছাগত হইলেন। সেই অবস্থায় কতক্ষণ অতীত হইলে পর, কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া গেল, "দ্বারিকানাথ! তুমি কাতর হইও না, তোমার অদৃষ্ট দেবতা সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, ধর্ম্মপথে মতি রাখিও, সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইবে"। মূর্চ্ছান্তে প্রভাতে যখন দ্বারিকানাথের চৈতন্য সম্পাদন হইল, তখন আর সন্ন্যাসীকে আশ্রমে দেখিতে পাইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

" মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপাস্তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং॥"

(ভাগবত।)

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পর, কয়েক বৎসর দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইয়া গেল। দ্বারিকানাথ আরও একটু বড় ও বুদ্ধিমান হইলেন। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময় বঙ্গদেশে জমিদারীর গৌরব তত ছিল না। এমন কি? বর্দ্ধমান রাজের সুবিস্তীর্ণ জমিদারীও খাস তহশীলে আদায় হইত। এতদ্দেশে বর্দ্ধমান রাজসংসারের এলাকা চতুর্দ্দিকেই ব্যাপৃত, সে মতে হুগলী জেলায়ও অনেকগুলি মহল মহারাজের খাসে ছিল। তৎকালে মোকররী কিম্বা পত্তনবিলির প্রথা তত প্রচলিত ছিল না, অথবা বিষয় কার্য্যে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত সহসা কেহ গ্রহণ করিতে সাহস করিত না, তাহা আমরা সঠিক জানি না। ফলতঃ দ্বারিকানাথ এই সুযোগ বুঝিয়া, দুই চারি খানা মহল ইজারা লইবার জন্য, মহারাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুরের নিকট আবেদন করিলেন। মহারাজ অত্যন্ত স্বজাতি প্রিয় ছিলেন, বিশেষতঃ দ্বারিকানাথের কৃতাঞ্জলি প্রার্থনায় এবং বিনয় নম্র বচনে, তাঁহার দয়াদ্র্ চিত্ত গলিয়া গেল। আরও এ প্রদেশস্থ জমিদারী মহলের কর খাস তহশীলে আদায়ের নানা বিশৃঙ্খলতার

বিষয় মহারাজ পূর্ব্বাবধি অবগত থাকায়, দ্বারিকানাথের প্রার্থনামত, তাঁহার মাতুলের সম্পত্তি প্রতিভূস্বরূপ আবদ্ধ রাখিয়া, কয়েকখানি জমিদারী সন্তোষের সহিত তাঁহাকে ইজারা বিলি করিলেন।

সেকালে নীলের ব্যবসা এতদ্দেশে অতিশয় প্রবল ছিল। অধুনা ঐ ব্যবসা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সময়ে জমিদার, তালুকদার, কিম্বা অন্যপ্রকার ভূম্যধিকারী মহাজন; অথবা বর্দ্ধিষ্ট লোক ব্যতীতও অনেকেই উক্ত ব্যবসা করিতেন। দ্বারিকানাথও অসাধারণ বুদ্ধিবলে এবং এই সকল ইজারা মহল অবলম্বনে, নীলের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত উভয়বিধ কার্য্যে অল্প দিনের মধ্যে, তাঁহার সাময়িক অবস্থার কতকটা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তখন মাতুলের পরামর্শমত ত্বদীয় ভবনের অনতিদূরে “জলাঘাটা” নামক গ্রামে, বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইলেন। বসবাসের কারণ, তাঁহার মাতুল তাঁহাকে কতকগুলি নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যান, অদ্যাবধি তাঁহার মাতুলানী ক্ষমা বিবির “তায়দাদ” নামে ঐ সকল সিদ্ধ নিষ্কর ভূমি, সিঙ্গুর প্রদেশের স্থানে স্থানে বিস্তৃত আছে।

সংসার সম্বন্ধে বাল্যকালাবধি তাঁহার অত্যন্ত দ্বেষ ভাব লক্ষিত হইত; কিন্তু ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে, তাহা আর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। অল্প বয়সে বিষয়কার্য্যে এবং উপায়োপার্জ্জনে নিপুণতা দৃষ্টে, স্বজাতি মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে লালসান্বিত হইলেন। তখন অগত্যা মাতুলের যত্নে, এবং মাতার ঐকান্তিক অনুরোধে, অত্যল্প অগ্র-

পশ্চাতে দুইটী সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, সংসার বন্ধনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলেন।

কাল সহকারে, করুণাময়ের কৃপায়, তাঁহার উভয় পত্নীরই এককালে গর্ভচিহ্ন লক্ষিত হইল। এবং যথাসময়ে, জ্যেষ্ঠার গর্ভে কন্যা এবং কনিষ্ঠার গর্ভে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। অভিনব জাত সন্তানগণের জন্ম নক্ষত্রাদি গণনা করিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিলেন যে, সন্তানটী চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত এবং মহেন্দ্রক্ষণে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, নিশ্চয়ই উহার দ্বারা উহার জনক জননীর সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক।

সে সময়ে দ্বারিকানাথ ইজারা বাকির দায়ে দায়গ্রস্ত হইয়া বন্দোবস্ত করিবার জন্য, বর্দ্ধমান রাজসরকারে উপস্থিত ছিলেন। দৈবগতিকে যে দিবস যে সময়ে ঐ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তিনিও সেই দিবস সেই সময়ে মহারাজের অনুগ্রহে, বাকির বন্দোবস্ত করিয়া বাটী আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

স্বালয়ে সমাগত হইয়া এই উভয় কারণে, তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। পুত্রটী সুলক্ষণ সম্পন্ন দেখিয়া, তাঁহার মনোমধ্যে অপত্যস্নেহের স্রোত এত প্রবল হইল যে, তাহার দুর্দ্দমণীয় বেগ রোধ করা দ্বারিকানাথের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। এমন কি। তিনি তদবধি শিশু সন্তানটীর লালনপালন এবং তত্ত্বাবধারণে সদাসর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। ক্রমে যথা সময়ে, সন্তান সন্ততির অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার সুসম্পন্ন করিয়া, পুত্রটীর মহেন্দ্রক্ষণে জন্মবিধায়ে "মহেন্দ্রনাথ" নাম সংরক্ষণ করিলেন।

এদিকে স্বপত্নী পুত্রের প্রতি স্বামীর ঐকান্তিক স্নেহ ও

যত্ন দেখিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর হৃদয়ে দুরন্ত ঈর্ষানল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিরাশির ন্যায়, প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিল। কাল সহকারে, সেই অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিশ্চয়ই যে ঐ বালককে একদিন না একদিন দগ্ধ করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। দ্বারিকানাথও বুঝিতে পারিলেন না, যে এই সামান্য কারণে, সেই অনল একটী রমণী হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে, চিরকালের জন্য অলক্ষিতভাবে ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকিবে। কিন্তু "ভবিষ্যৎ ভেবে কেবা বর্ত্তমানে মরে"? সেজন্য এখন হইতে চিন্তিত হইয়া আমাদের ফল কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কমলার কৃপা হইলে, মনুষ্যের কিছুরই অভাব থাকে না। নিয়তই তাহার অবস্থা উন্নত এবং আশা ফলবতী হইতে থাকে। দ্বারিকানাথেরও তাহাই ঘটিল। এতদিনের পর তাঁহার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন। দুঃখাবর্ত্তন অপসারিত হইল। সৌভাগ্যসূর্য্য সহস্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া, তাঁহার অদৃষ্টাকাশে আসিয়া দেখা দিল। তখন "ধূলা মুঠার পরিবর্ত্তে কড়ি মুঠা" অর্জ্জন হইতে লাগিল। ক্রমে ইজারা হইতে পত্তন মহল গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নীলের ব্যবসা আরও অধিক বিস্তার করিয়া একে একে নয়টী নীলকুঠী চালাইতে লাগিলেন।

সেই সময় বর্দ্ধমানের বৃদ্ধ মহারাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুর

পরলোকগত হওয়ায়, রাজবাটীতে অত্যন্ত হুলস্থূল পড়িয়াছিল। কুমার তেজচন্দ্র বাহাদুরের সহিত বৃদ্ধা মহারাণী * বিষনকুমারীর কোন গুহ্য কারণ বশতঃ, বৈষয়িক মনোবাদ ঘটায়, সেই উপলক্ষে সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রধান প্রধান মহলের জমিদারী-স্বত্ব, হুগলী ও বৰ্দ্ধমান কালেক্টারির লাটে "মালগুজারি" বাকির দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। সেই সুযোগে ভাস্তাড়ার ছক্কন লাল সিং, জনাইএর মুখোপাধ্যায়, তেলিনী পাড়ার বন্দোপাধ্যায়, সিঙ্গুরের দ্বারিকানাথ বাবু এবং অপরাপর কতিপয় জমিদার সেই সকল জমিদারী অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া লইলেন। ফলতঃ, মহেন্দ্রনাথের জন্ম হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে দ্বারিকানাথ বাবু "লাট মণ্ডল ঘাট" প্রভৃতি সত্তের লাট জমিদারী অবলীলাক্রমে ক্রয় করিয়া, অল্প দিনের মধ্যে একজন গণ্যমান্য এবং প্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া খ্যাত হইলেন। সেই সময়ে অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ, সরোবর খনন, শিবালয় এবং দেবালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া, মহাসমারোহের সহিত "শ্রীশ্রী ৺রাধাগোবিন্দজী" নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সে কালের বড়লোকদিগের সাহেব কেনা একটা গৌরবের কথা ছিল। দ্বারিকানাথ বাবু তাহাতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এতদ্ব্যতীত, নিত্য নিত্য অজস্র অর্থ সমাগমের সহিত, তেজারতী ও মহাজনী কার্য্য রীতিমত চালাইতে লাগিলেন। ফলতঃ, তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ শ্রমশীল ও ভাগ্যবান পুরুষ, হুগলী জেলার মধ্যে আর দৃষ্টিগোচর হইত না।

---

* Vide—W. W. Hunter's Statistical account of Burdwan Vol IV Page 142

তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যরাশির সঙ্গে সঙ্গে বংশেরও দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে তিন পুত্র ও তিন কন্যা, এবং কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র ও দুই কন্যা, সর্ব্বসমেত পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা পর্য্যায়ক্রমে জন্মগ্রহণ করিল। উক্ত পঞ্চপুত্রের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যে মধ্যম ব্রজনাথ, তৃতীয় রাধানাথ, চতুর্থ শ্রীনাথ এবং যদুনাথ পঞ্চম বা কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার কন্যাগণেরা সকলেই বিবাহিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও বংশ না থাকায় তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করা গেল না।

মহাত্মা দ্বারিকানাথের উন্নতির সম্বন্ধে কতকগুলি দুষ্ট-লোক অনেক মিথ্যাপ্রবাদ রটনা করিয়াছিল। কেহ বলিত তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, কেহবা অন্য কোন প্রকার কল্পিত দোষ দেখাইয়া, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিত। ফলতঃ আমরা এ সকল অমূলক এবং ভিত্তিহীন প্রবাদের অণুমাত্র পক্ষপাতী নহি। আমরা বলি "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং ন বিদ্যা ন চ পৌরষং"। দ্বারিকানাথ তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে যেরূপ অদ্ভুত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের পক্ষে বিস্ময়কর হইলেও অসম্ভব নহে। তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পর্য্যন্ত অর্জ্জন স্পৃহায় বিরত ছিলেন না। তাঁহার উইল দৃষ্টে জানা যায় যে, তিনি পিতৃপিতামহের এক কপর্দ্দকমাত্র সাহায্য না পাইয়া এবং পরাধীনতা স্বীকার না করিয়া, কেবল স্বকীয় ক্ষমতাবলে মৃত্যু-

কালে নিম্নলিখিত শতের লাট জমিদারী * (যাহার সম্যক আয় অন্যূন পাঁচলক্ষ টাকা, তৎসওয়ায় নীল, রেশম, মহাজনী, তেজারতী এবং নিষ্কর ভূসম্পত্তির আয় পৃথক ছিল) পরিত্যাগ করিয়া যান। যদিও তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার প্রধান জমিদারী "লাট মণ্ডলঘাট," (যাহার উপস্থিত মুনাফা অন্যূন তিন লক্ষ টাকা) রীতিমত বন্দোবস্ত এবং শাসন করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার সময়ে যে যে খাল খনন, বাঁদ বান্ধাই, এবং সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়, তাহা অদ্যাবধি অবিচ্ছিন্ন থাকায় ভিন্ন ভিন্ন জমিদারগণ তাহার ফলভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সময়ে কোলা, বাকৃসী, মানকুর নামে যে তিনটী পারাবারের ঘাট (Ferry ghaut) সংস্থাপিত হয়, † তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ত্বদীয় বংশাবলীকে (Compensation) অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পঞ্চান্ন হাজার টাকা এককালে প্রদান করেন।

---

* ১।	লাট হৃদয়রামপুর।	১০।	লাট দক্ষিণবাড়।
২।	,, গণেশপুর।	১১।	,, সাঁকথালি।
৩।	,, বৈকুণ্ঠপুর।	১২।	,, শ্রীপুরাপুর।
৪।	,, ধান্যগাছা।	১৩।	,, কুমির মোড়া।
৫।	,, কুলদহ।	১৪।	,, মল্লিকপুর।
৬।	,, আগর।	১৫।	,, বাহিরগড়া।
৭।	,, বনপুর।	১৬।	,, বেলী।
৮।	,, নেকেড়বাণ।	১৭।	,, মণ্ডলঘাট।
৯।	,, পাঁড়রা।		

† Vide Hon'ble Harisson's Embarkment Manual.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটি শতৈরপি।
অবশ্য মেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।"

মহাভারত।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আসিতে ও যাইতে লাগিল। অনন্ত অপরিমেয় কালের স্রোত অবিরাম অবিশ্রান্তবেগে প্রবাহিত হইয়া চলিল। দ্বারিকানাথের সুখের দিন শীঘ্র শীঘ্র ফুরাইয়া যাইতেছে, তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না। কেনই বা করিবে? কেবল পীড়িতের রুগ্ন শয্যায় অথবা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, বিরহির ভগ্নহৃদয়ে অথবা বন্দির কারাগৃহেই দুরন্ত কালের পরাক্রম দৃষ্টিগোচর হয়। মনুষ্যের অবস্থা কখন চিরকাল সমভাবে যায় না। তাই ভবিষ্যৎ-অন্ধ-মানব আপনার পরিণাম না জানিতে পারিয়া প্রফুল্লমনে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে।

ধৃতরাষ্ট্র যদি জানিতে পারিতেন, যে কুরুক্ষেত্র সমরে তাঁহার শত পুত্র ধ্বংস হইবে, কুরুবংশ ক্ষিতিতল হইতে একেবারে নির্ম্মূল ও নির্ণাম হইয়া যাইবে, তাহা হইলে তিনি কখন অপরিণামদর্শী দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দিতেন না। শাহাজাহান যদি জানিতে পারিতেন, যে ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাচীন বয়সে কারারুদ্ধ করিবেন, সুবিস্তীর্ণ যবনরাজ্যের হেমদণ্ড তাঁহার হস্তস্খলিত হইবে, তাহা হইলে তিনি কখন দিল্লীর রাজসিংহাসন স্পর্শ করিতেন

না। দ্বারিকানাথও যদি অণুমাত্র জানিতে পারিতেন যে, এমন সুখের সময় সেই প্রাণসমপ্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পত্নীর অনুরোধে বিনা কারণে বিসর্জ্জন দিতে হইবেক, তাহা হইলে তিনিও কখন দারপরিগ্রহ করিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় অদৃষ্টের গতি কে খণ্ডাইতে পারে? বহুবিবাহরূপ সাগর মন্থনে যে গরল উৎপন্ন হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি? যে কবিগুরু,শ্রীরামচন্দ্রের নির্ব্বাসন কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনিই এই মোহমন্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে দীক্ষিত; কৈকেয়ীকে বরদানে প্রতিশ্রুত হওয়াবধি এই করালছায়া দশরথশিরে বিদ্যমান ছিল, তাহা বাল্মীকি স্বয়ং "রামায়ণে" প্রাঞ্জলীকৃত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমাদিগেরও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

দ্বারিকানাথ বাবুর দুই পত্নী ছিল। জ্যেষ্ঠার নাম বিষন্ কুমারী এবং কনিষ্ঠার নাম অমৃতকুমারী। কিন্তু চিরপ্রচলিত রীত্যনুসারে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সর্ব্বদাই মনোমালিন্য ঘটিত। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং অল্প বয়সে কার্য্যক্ষম ও সুনিপুণ দেখিয়া, দ্বারিকানাথ তাঁহার প্রতি অধিকাংশ বিষয়কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। সে কালে অল্প টাকা দাবির * যে সকল মোকর্দ্দমা মুন্‌সেফ্‌দিগের বিচার্য্য ছিল, তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে জমিদারগণের উপর সোপর্দ্দ থাকিত। দ্বারিকানাথ বাবুর উপরও সেরূপ ভার থাকায়, তিনি উপরিস্থ হাকিমগণের অনুমতিক্রমে সে সকল কার্য্য স্বয়ং না করিয়া মহেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত করি-

* চৌষট্টী টাকা দাবির মোকর্দ্দমা।

তেন। যুবা মহেন্দ্রনাথ স্বীয় দূরদর্শিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির গুণে স্বদেশে ও সমাজে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, বিচার কার্য্যেও সেইরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া অর্থী ও প্রত্যর্থী-গণের মনোরঞ্জন করিতে এবং পিতার ও উপবিস্থ হাকিম-গণের সন্তোষপ্রদ হইতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

মহেন্দ্রনাথ যতই শিষ্ট শান্ত ও যতই বিনয়ী হউন না কেন, তাহাতে তাঁহার বিমাতা বিষনকুমারীর হৃদয়ে অণুমাত্র স্নেহের সঞ্চার হইত না। মহেন্দ্রনাথ যখন শৈশবে মাতৃ-ক্রোড়ে স্তন্যদুগ্ধে লালিত হইতেন, তখন হইতেই বিমাতার বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে স্বপত্নীপুত্রের এতাধিক প্রাধান্য দর্শন, তাঁহার চক্ষে শেলসম বাজিতে লাগিল। হৃদয়ে যেন সহস্র বৃশ্চিকবৎ দংশন করিতে লাগিল। যে ঈর্ষানল এতদিন তিনি গোপনে হৃদয়মধ্যে লুকায়িত রাখিয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে প্রচণ্ডবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন অশেষ মন্ত্রণাজাল বিস্তার করিয়া, নানাপ্রকার কল্পিত দোষ নিত্য নিত্য স্বামীসম্মুখে কীর্ত্তন করিয়া, যাহাতে মহেন্দ্রনাথের নির্ব্বাসন এবং স্বীয় গর্ভজাত পুত্র ব্রজনাথের উন্নতিসাধন হয়, তাহার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দ্বারিকানাথ এইসকল অমূলক প্রবাদ নিত্য নিত্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ যদিও উত্যক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিষনকুমারীর বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না; বরং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অচল ও অটল ভাবে মহেন্দ্রনাথের কুৎসা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিতে লাগিলেন। নিত্য নূতন নূতন কলঙ্কারোপ

করিয়া মহেন্দ্রনাথের সর্ব্বনাশ ও ব্রজনাথের উন্নতির পথ প্রশস্থ করিবার উদ্যোগ করিলেন। মাতৃবৎসল মহেন্দ্রনাথ এইসকল কথা শুনিয়া একদিন বিমাতৃচরণে লুণ্ঠিত হওতঃ রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন, যে "কেন মা। আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিযাছি, যে আপনি আমার উপর রাগান্বিত হইযা আমার সর্ব্বনাশে সমুদ্যত? আমিতো জ্ঞানতপক্ষে কোন দোষ করি নাই? আমিতো মাতা এবং বিমাতা পৃথক বলিযা জানি না, সহোদর এবং বৈমাত্র ভ্রাতা ভিন্ন বলিয়া ভাবি না, তবে কেন আপনি আমাকে অস্নেহ করেন? পিতার সমক্ষে নিত্য নিত্য মিথ্যা করিয়া আমার নামে অনুযোগ করেন?" কিন্তু এসকলে বিমাতার কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইল না, ররং তাঁহার পূর্ব্বসংকল্প অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া, মহেন্দ্রনাথের অমঙ্গল অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

অবশেষে কিছুতেই নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিয়া ক্রূরমতি, হিংসাপরায়ণা, পরার্থদ্বেষীণী, কুটিলচরিত্রা বিষন্ কুমারী, মহেন্দ্রনাথের নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ চরিত্রে এমন অভাবনীয় ভীষণ কাল্পনিক কলঙ্কারোপ করিয়াছিলেন যে, তাহতে মহাত্মা দ্বারিকানাথও বুদ্ধিভ্রংশ এবং হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া আপনার প্রকৃতি হারাইলেন। অপত্যস্নেহের স্রোত তাঁহার হৃদযে যতই প্রবল থাকুক না কেন, প্রবল স্রোতস্বিনীর নিকট সামান্য বালির বাঁধের ন্যায় তাহা অচিরাৎ ভাসিয়া গেল। এবং সেই অবস্থায় সেই অনুপমের বাৎসল্যবন্ধন ছিন্ন করতঃ তাঁহাকে নিজ জমিদারীর অন্তর্গত

চন্দ্রকোনার বনে বির্ব্বাসন আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন বিমাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণী ভুজাগ্রমণী
সীতা সত্য পরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ
দোর্দ্দণ্ডেন সমোনচাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুঃ স্বযং
রামো মন বিড়ম্বিতোপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা।"

এমন যে রঘুকুল ধুরন্ধর পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র, রামাবতারে মানবলীলার্থে অবতীর্ণ হইযা, রাজ্যাভিষেক দিবসে তাঁহাকেও বিধির বিপাকে অদৃষ্টদোষে দীনবেশে অরণ্যাচারী হইয়া অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। আরও দেখ, ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠীরকেও ভাগ্য দোষে রাজ্যচ্যুত হইয়া, দ্বাদশবর্ষ বনগামী ও একবৎসরকাল অজ্ঞাতবাসে বিরাট ভবনে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাল কাটাইতে হইয়াছিল। অতএব, অদৃষ্টাধীন কার্য্যের অনুগামী না হইতে হইয়াছে, এমত লোক জগতে অতি বিরল। সুতরাং, মহেন্দ্রনাথকেও ভাগ্যদেবীর ভ্রুকুটীতে পতিত হইতে হইয়া, পৈতৃক সম্পত্তি উপভোগে বঞ্চিত হইতে হইল।

কিন্তু হায়, সে কি ভয়ানক দুর্দ্দিন! কি ভীষণতম দুর্দ্দৈব!! কি অনৈসর্গিক দৈব বিড়ম্বনা!!! মহেন্দ্রনাথের নির্ব্বাসন সংবাদে পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইল।

তখন তাঁহার সেই স্নেহময়ী জননীর হৃদয়বিদারক ক্রন্দনে, ভ্রাতৃবৎসল কনিষ্ঠ সহোদরের মর্ম্মান্তিক রোদনে, মহেন্দ্রগত-জীবন পিতার অবিরল অশ্রুধারায়, পৌরজনবর্গের বিকট চীৎকার ধ্বনিতে, এবং সিঙ্গুরবাসী কি ধনী, কি নির্ধন, আবালবৃদ্ধ বনিতার করুণ আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এমন কি! সর্ব্বজনপ্রিয়, সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন মহেন্দ্রনাথের নির্ব্বাসন সংবাদে, যেন পশুপক্ষী পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে দিনের সে কথা স্মরণ হইলে, এখনও হস্ত হইতে লেখনি স্খলিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু হায়! বিধির ললাটলিপী অখণ্ডনীয়। এই কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, সকলকেই আপনাপন অদৃষ্টের ফলভোগ করিতে হইয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট হইতে অতি দীন দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেরই উপর অদৃষ্ট সমভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

মহেন্দ্রনাথের নির্ব্বাসনে তাঁহার বিমাতৃপুরী আনন্দরোলে ও কুতূহল ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন নানাপ্রকার আশা আসিয়া বিমাতৃহৃদয়কে উৎসাহিত করিতে লাগিল। যে আশার কুহকজালে আবদ্ধ হইয়া বিষনকুমারী মহেন্দ্রনাথের অমঙ্গল কামনা করিতে পারিয়াছিলেন, যে আশার ছলনায় বিমুগ্ধ হইয়া তিনি পুত্রগতপ্রাণা স্বপত্নীকে চিরজীবনের জন্য অকূল শোকসাগরে ভাসাইতে পারিয়াছিলেন, যে আশার বিশ্ববিমোহিনী আশায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি সংসার-বিশৃঙ্খলতা ভ্রমেও কল্পনা করেন নাই, যে আশার মোহমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি বৃদ্ধ স্বামীর ইষ্টানিষ্ট এক মুহূর্ত্তের

জন্য চিন্তা করেন নাই, যে প্রলয়ঙ্করীআশার আশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া তিনি ইহকাল পরকাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন, লোকধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সমাজে চিরঘৃণিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন, সেই আশা এতদিনের পর বহুযত্নে, বহু আয়াসে ফলবতী দেখিয়া যে তাঁহার হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করিবে, ইহা কোন্ বিচিত্র কথা? আশা কখন মনকে উন্নত করে, কখন মানবকে অধঃপাতে দেয়। কেবল আশার বলেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমভাবে চালিত হইতেছে। আশা না থাকিলে, এ জগৎ দুঃখাবহ হইত সন্দেহ নাই। আশাই মানবজীবনের আনন্দ প্রদায়িনী, ইহ সংসারের পরিতৃপ্তি সাধিনী এবং হতাশের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিকারিণী। হায় আশা। তাই বুঝি আজ বিবিধপ্রকার কল্পিত মূর্ত্তিতে আসিয়া, বিষনকুমারীর চক্ষে দেখা দিতেছ?

বিমাতা যতই সন্তুষ্ট হউন না কেন, এরূপ সুসন্তানকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, কর্ত্তা তিলার্দ্ধের জন্যও সুখী হইতে পারিলেন না। বরং পুত্রের নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পুত্রশোক শেলসম হৃদয়ে বাজিল। সেই আঘাতেই বক্ষঃস্থল ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া, শোকে, দুঃখে, মনস্তাপে আচ্ছন্ন এবং অবসন্ন হওতঃ অনবরত "হা মহেন্দ্র! হা মহেন্দ্র।" রবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই নিদারুণ ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সে দুরারোগ্য পীড়া হইতে দ্বারিকানাথ বুঝি আর এজন্মে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"কিম্বা সয়ম্ভূ শিব শক্তি বিষ্ণুঃ কপাল দুঃখং ন করোতি ধ্রুবং।
অতঃপরোজীব স্বকর্ম্মভোগঃ কপালঃ কপালঃ কপালঃ মূলঃ॥"

(মহাজন গৃহীতবাক্যং।)

শীতকালের দীর্ঘরজনী অবসানপ্রায় হইয়াছে। মৃদুমন্দ শৈত্য সমীরণ হিল্লোলে শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। ঈষৎ রক্তিমাভ মূর্ত্তিতে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে দেখা দিতেছেন। সেই সময়, সেই জনমানব শূন্য চন্দ্রকোনার অরণ্যে, একজন অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের রেখাপাত করিতেছেন। এই মাত্র রাত্র প্রভাত হইতেছে। নব সূর্য্যালোকে উন্মত্ত হইয়া পক্ষিগণ স্বানন্দে কলরব করিতেছে, উড়িতেছে, নড়িতেছে, আবার বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিতেছে। কম্পিত বৃক্ষপত্র হইতে স্খলিত শিশিরবিন্দু পতিত হইয়া যুবকের গাত্রবস্ত্র সিক্ত করিতেছে। নিবিড় বৃক্ষরাজী সমাকীর্ণ অরণ্য, মনুষ্যসমাগমের চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না। কেবল নরমাংস লোলুপ হিংস্র জন্তুগণের আবাসভূমি বলিয়া অনুমিত হয়।

সেই অরণ্যের এক প্রান্তভাগে বসিয়া মহেন্দ্রনাথ রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন। পূর্ব্বদিনের ভয়ানক পথশ্রমের পর সমস্ত রাত্র অনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে আবার দারুণ শীতে সর্ব্বাঙ্গ "থর থর" কাঁপিতেছে। এই কয়েকদিনের মধ্যে সেই তপ্তকাঞ্চনবৎ উজ্জ্বলবর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। প্রশস্ত দীপ্তিমান্ ললাটে কালিমারেখা সূর্য্যা-

লোকে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইতেছে। এমন কি। এ মহেন্দ্রনাথকে আর সে মহেন্দ্রনাথ বলিয়া সহসা চেনা যায় না।

মহেন্দ্রনাথ সেই অবস্থায় শোক-তাপ বিগলিত অন্তঃকরণে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া জগৎনিয়ন্তার অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় বিশ্বকৌশল আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহার আহার নিদ্রাভাবে ক্লিষ্টদেহ উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং চক্ষু দিয়া দর দর বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

বিধাতা! তোমার একি রীতি? যে সুন্দর বালক সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ বলিয়া বোধ হইত, তাহার অদৃষ্টে এ যাতনা কেন দেব? দুগ্ধ-ফেন-নীভ-শয্যাতে যিনি শয়ন করিতেন, ক্ষির, সর, নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য আহারেও যাঁহার রুচি হইত না, সুরম্য অট্টালিকা যাঁহার আবাসভূমি ছিল, সেই মহেন্দ্রনাথ আজ কি পাপে, কোন্ অভিসম্পাতে এই নবীন বয়সে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সকল আশাভরসা পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যাচারী হইয়া বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট? মানি, মনুষ্যের সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে দেখা যায়, যাহারা পরম ভাগ্যবান্ হইয়া এ সংসারে আজীবন সুখে কাটাইতেছে, দুঃখ কাহাকে বলে আদৌ জানে না, কখনও ভোগ করে নাই। তবে মহেন্দ্রনাথের সুখের দিন এত শীঘ্র শীঘ্র শেষ হইল কেন? কেন তিনি এত অল্প বয়সে সুখভোগে বঞ্চিত হইলেন? আর এই যদি তাঁহার ভবিতব্যে লেখা ছিল, তবে প্রভু, কোন্ উদ্দেশে কি অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ভূমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ইহা কি তাঁহার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত না ইহলৌকিক পাপের পরি-

ণাম? যাহা হউক, তুমিতো বিশ্বস্রষ্টা দেব, ইচ্ছা করিলেই যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভাঙ্গিয়া চুবিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িতে পার, তখন মহেন্দ্রনাথের ছার ললাটলিপি কি আর মুছিতে পাবিতে না? তাহা নহে! তোমাব অনন্তলীলা তুমিই জান।। এ ক্ষুদ্র মানববুদ্ধিব অতীত। আমি কে, কি নিমিত্ত আসিয়াছি, আমার দ্বারা তোমাব কি উপকাব সাধিত হইবে, প্রভু। ইহাই যখন জানি না, তখন তোমার বিষয় চিন্তা করিবার আমাব কি ক্ষমতা?

কিন্তু এখন আর সে কথায় কাজ নাই। আমবা আমাদের মহেন্দ্রনাথেব কথাই বলিব। যে মহেন্দ্রনাথ পিতার স্নেহের ধন, এবং মাতার আদবেব সন্তান বলিয়া আপনাকে অহঙ্কৃত বোধ কবিতেন, তিনিই আজ আবাব উপেক্ষিত হইয়া এই বিশাল সংসাবাবণ্যে পবিভ্রমণ কবিতেছেন, তিনিই আজ অকাতবে শীতের হিমানী এবং বৌদ্রেব প্রখবতব উত্তাপ সমভাবে সহ্য কবিতেছেন। বেলা প্রায় প্রহবাতীত হইয়াছে, মার্ত্তণ্ডদেব বিমানপথে দাঁড়াইয়া ঈষদুষ্ণ কিরণজাল বিস্তার কবিতেছেন। সেইসময় কয়েকজন কাঠুরিয়া কাষ্ঠ আহবণার্থে সেই অরণ্যপথ দিয়া গমন করিতেছিল। সহসা তাদৃশ নিভৃত প্রদেশে ঈদৃশরূপ লাবন্যসম্পন্ন যুবা পুরুষকে দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইল। তখন তাহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া, যাষ্টাঙ্গে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কবিল। মহেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আশ্রমানুসন্ধানোৎসুক হওয়ায়, তাহারা সন্তোষের সহিত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পথ প্রদর্শন

পূর্ব্বক লইয়া যাইতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথও ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত দেহে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"Oh solitude! Where are the charms
That sages have seen in thy face,
Better dwell in the midst of alarms,
Than reign in this horrible place."

(Cowper.)

প্রায় অর্দ্ধক্রোশ গমন করিলে পর, সেই বনের পূর্ব্বপ্রান্তে কালিকাদেবীর একটী পুরাতন মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। তখন সেই পথ প্রদর্শক কাঠুরিয়াগণ, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণার্থ উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্রনাথ দেখিলেন স্থানটী বড়ই রমণীয়। মন্দিরের পশ্চাৎভাগে একটী দীর্ঘাকার অট্টালিকা যেন দীনহীন নিরাশ্রয় পথিকগণকে আশ্রয় দিবার জন্যই দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখে মনোহর পুষ্পোদ্যান, তাহার পরেই একটী দীর্ঘাকার সরোবর, তাহার চতুষ্পার্শ্বে নানাজাতি বৃক্ষরাজী সারি সারি বিরাজিত ও নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল ফুলে সুশোভিত, এবং সৌরভে প্রাঙ্গণভূমি আমোদিত করিতেছে। যাঁহারা ক্ষণ:

প্রভাব ন্যায় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর চঞ্চলতা দেখিয়া, সর্ব্বপ্রকার উদাসীনতা অবলম্বন করিয়াছেন, এ অরণ্য যেন যথার্থই সেই সংসারবিরাগী তাপসগণের আশ্রয়স্থান বলিয়া বোধ হয়।

মহেন্দ্রনাথ, উদ্দেশে দেবীচরণে প্রণিপাত করতঃ সম্মুখস্থ সরোবরনীরে হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ সোপানোপরি উপবেশন করিলেন। পরক্ষণেই দেবীর "সেবায়েৎ" ব্রাহ্মণ পুষ্পচয়নার্থে তথায় উপস্থিত হইয়া, সহসা এরূপ অসামান্য রূপবান্ যুবাপুরুষকে দৃষ্টি করতঃ কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহেন্দ্রনাথ প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া কহিলেন "আমি বনবাসী তপস্বী। নানাপ্রকার হিংস্রজন্তু সমাকুল এই অরণ্য দেখিয়া, দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণার্থে আসিয়াছি।' সেবায়েৎ ব্রাহ্মণ অতিশয় শিষ্ট সম্প্রদায় অথচ বয়ঃপ্রবীণ ছিলেন। মহেন্দ্রনাথের সাধারণ পরিচয়ে তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি কহিলেন "আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্টে, আপনাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না। যদিও কোন গুহ্য কারণ বশতঃ অরণ্যাচারীর ন্যায় ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু আপনার অবয়ব দৃষ্টে কোন মহাবংশ প্রসূত মহাত্মা বলিয়া নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে। আপনি কি আমাকে প্রকৃত পরিচয় দিবেন না?" মহেন্দ্রনাথ তখন অন্যমনে কি চিন্তা করিতেছিলেন, অধিকারীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। ব্রাহ্মণ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সে কথা আর পুনরুত্থাপন না করিয়া, যত্ন সহকারে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ

করিলেন। এবং একটী নিভৃত কক্ষ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তথায় তাঁহার বিশ্রামার্থ যথাসাধ্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণের আতিথ্য সৎকারে চরিতার্থ হইয়া, সেই-খানে নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ ইষ্টনিষ্ঠা পরায়ণ ছিলেন। দেবতা ব্রাহ্মণে প্রগাঢ় ভক্তি বাল্যাবধি তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান ছিল। বিশেষতঃ এই নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থ জনমানবশূন্য পান্থশালায় বসিয়া, কেবল সেই অনাদি অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণভাগে একটি বৃহদাকার "জড়ুরের" রেখা ছিল। একদিন মধ্যাহ্নকালে মহেন্দ্রনাথ অনাবৃতদেহে দেবীর মন্দির মধ্যে সেই বৃদ্ধ অধিকারীর সহিত কথোপকথন করিতে ছিলেন, সহসা অধিকারীর দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল। অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন "আপনার পৃষ্ঠদেশে ও কিসের চিহ্ন?" মহেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন "জড়ুলের রেখা"। ব্রাহ্মণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অনেকক্ষণ তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "তারই কি এই ফল?" মহেন্দ্রনাথ ধীর স্বরে উত্তর করিলেন "ভবিতব্য কি বোধ হয়"? অধিকারী বলিলেন "হয় না বটে, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে আপনার এ অবস্থা একদিন না একদিন পরিবর্ত্তন হইবে। যদি জ্যোতিষশাস্ত্র সত্য হয়, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণবাক্য ধ্রুব বলিয়া জানিবেন। আপনিতো বালক, এই আপনার নবীন বয়স, এখনও দীর্ঘকাল সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে।

জানিবেন, যে একদিন আপনার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া বঙ্গদেশকে বিভাসিত করিবে। সেদিন কি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ থাকিবে ?

মহেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন "আমি আর সংসারসুখের বাসনা রাখি না"। বলিতে বলিতে ছিন্ন তার বীণার মত মহেন্দ্রনাথ নীরব হইলেন। অধিকারী চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার আয়ত লোচনদ্বয় জল-পূর্ণ হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

জ্যেষ্ঠা পত্নীর বাক্যে অনুরুদ্ধ হইয়া দ্বারিকানাথ বাবু যে কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। পুত্রগত-প্রাণা সরলা অমৃতকুমারীর মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাত হাতে হাতে ফলিল। মহেন্দ্রনাথের নির্ব্বাসনের পর, দারুণ পুত্রশোক তাঁহার হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিতে লাগিল। সেই হইতেই উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া তিনি শয্যাগত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি কোন মতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার জমিদারী চন্দ্রকোণার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত চৌধুরীকে মহেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য আদেশলিপি পাঠাইলেন। চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বাবধি মহেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগৃহিত ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু এ সংবাদের বিন্দু বিসর্গ পূর্ব্বে

অবগত না থাকায়, সহসা পত্র পাইয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক স্বভবনে লইয়া যাইবার জন্য যত্নবান হইলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, অগত্যা চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং পরিচারকবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই দেবালয়েই তাহার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত থাকিয়া, পুরাতন চাকরের কর্ত্তব্যপালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মাসাধিক অতীত হইলে, মহেন্দ্রনাথের তীর্থ পর্য্যটন বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইল, কিন্তু সে অবস্থায় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, কাহারও অনুমতি সাপেক্ষ না থাকায়, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করতঃ একদিন রজনীযোগে আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া অধিকারী এবং চৌধুরী মহাশয় আশ্রম প্রদেশস্থ বন, উপবন, পান্থশালা, প্রাঙ্গণভূমি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্রনাথকে আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

সেই গভীর রজনীযোগে কণ্টকাদি সমাকীর্ণ বনপথ অতিক্রম করিতে করিতে মহেন্দ্রনাথ অবিরাম অবিশ্রান্ত বেগে হাঁটিতে হাঁটিতে "কাটওয়াঁয়" আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং তথায় সুরধুনী দর্শন ও স্নান দানাদি করিয়া কিছুদিন শ্রান্তি দূর করতঃ অগ্রদ্বীপে "গোপীনাথ" নবদ্বীপে "শ্রীগৌরাঙ্গ" মূর্ত্তি দর্শনান্তর, মুরসিদাবাদের অন্তর্গত বরাকুলিতে স্বদীয় অভীষ্ট দেবতা আচার্য্য, প্রভুবংশীয় গোস্বামী ঠাকুরদিগের শ্রীপাঠ দর্শনার্থে গমন করিলেন। তথায় গুরুদেবের চরণসেবা

ও শ্রীশ্রীরাধা বিনোদজীব পাদপদ্ম দর্শন করিয়া কতিপয় দিবস পরম সুখে অতিবাহিত করেন। অনন্তর পুনরায় মুরসিদাবাদ হইতে নৌকাযোগে কাশী, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের একাংশ "মরিশৃঙ্গ" পর্ব্বতে সমাগত হইলেন। নিয়তী চক্রের নিষ্পেষণে প্রপীড়িত হইয়া মহেন্দ্রনাথ আজ সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেছেন। কত কত নদ নদী, বন জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত, উপত্যকা অধিত্যকা প্রভৃতি বিনা-ক্লেশে অতিক্রম করিতেছেন। তাঁহার সে রূপ, সে লাবণ্যময় অঙ্গসৌষ্ঠব শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি সেই বেশভূষা বিবর্জ্জিত দেহ, কেবলমাত্র এক খানি গৈরিক বস্ত্রে আবৃত থাকায়, সহসা দেখিলে বোধ হইত, যেন স্বয়ং রতীপতি মর্ত্তলীলা দর্শনার্থে তাপসবেশে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

"মরিশৃঙ্গে" পাণ্ডবস্থান নামে এক তীর্থ আছে। অজ্ঞাত-বাসের সময় যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদী সহ ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলেন। স্থানটী পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, নিভৃত এবং অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত। অদ্যাবধি কতকগুলি বৃহদাকার মহীরুহ বেষ্টিত একটী বেদী যেন পাণ্ডবদিগের কুটীরের নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শৈল খণ্ডের উপর শৈলখণ্ড স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকায় স্থানটীর শোভা দ্বিগুণ-তর বৃদ্ধি করিতেছে।

মহেন্দ্রনাথ তথা হইতে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করিতে করিতে নেপালে আসিয়া উপনীত হইলেন। নেপালে "পরেশনাথ" ও ভগবতীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলে

অতীব পাষণ্ডের অন্তঃকরণে ভক্তির উদ্রেক হয়। মহেন্দ্রনাথের কোমল হৃদয়ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। কিছুদিন তথায় অবস্থান করিলে, নেপালরাজের একজন খ্যাতনামা উকিলের সহিত তাঁহার সুপরিচয় হয়। সেই মহাত্মা, যুবা বয়সে মহেন্দ্রনাথের এতদূর ইষ্টনিষ্ঠা পরায়ণতা দেখিয়া, এবং তাঁহার সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে যখন রাজকার্য্য উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন ‡, তখন বিশেষ যত্ন সহকারে মহেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

এখানে শ্রীমন্ত চৌধুরীর পত্রে যেদিন কর্ত্তার কর্ণগোচর হইল যে, স্বদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ঐ অরণ্য হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কি হিংস্রক জন্তু কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ কিছুই জানা যায় নাই, সেইদিন হইতে তাঁহার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে পুত্রের জন্মাবধি তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী জাজ্বল্যমান হইয়াছিল, যাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়াবধি তিনি এক মুহূর্ত্তের

---

‡ মহেন্দ্রনাথ বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় পারিষদ স্বর্গীয় রশিকলাল মালিয়া কিছু দিবস জীবিত ছিলেন এবং তিনিই সময়ে সময়ে আক্ষেপ করিয়া এইসকল বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিতেন।

জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন নাই, নিরতিশয় যত্ন সহকারে সর্ব্বদাই যে পুত্রের লালন পালনে ব্যাপৃত থাকিতেন, যাঁহার শীলতা, নম্রতা এবং কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তিনি সফল মনোরথ হইয়াছিলেন, এমত সুশীল ও নিরপরাধী পুত্রকে ইহজন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া, পিতা যে মনোমধ্যে বিষমতর মর্ম্মাহত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

যাহা হউক, অনবরত সেই সকল চিন্তা করায়, উৎকট রোগ আসিয়া তাঁহার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এবং তাহাতেই তাঁহার জীবনগ্রন্থি দিন দিন শিথিল হইতে লাগিল। তাঁহার চিকিৎসার্থে নিত্য রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া কত দেশ দেশান্তর হইতে কত কত হাকিম, কবিরাজ, ডাক্তার আনাইয়া নিযুক্ত করা হইল, কত কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শান্তি স্বস্ত্যয়নে রত হইলেন, কত গ্রহবিপ্রগণ বিরুদ্ধ গ্রহদেবতার সন্তোষার্থে পূজা, হোম, পুরশ্চারণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সে রোগ প্রশমিত হইল না। অবশেষে, বৈদ্যবাটী ঈশ্বরী তীরে তীরস্থ করাই সর্ব্ববাদি মতে যুক্তি যুক্ত হওয়ায় অচিরাৎ তথায় সমানীত হইলেন।

মহেন্দ্রনাথ কলিকাতায় পঁহুছিয়াই শুনিলেন যে, তাঁহার পিতা উৎকট পীড়াগ্রস্ত। জ্বর-ভুক্ত-ক্ষয়-কাশে আক্রান্ত হইয়া, বৈদ্যবাটী ভাগীরথী তীরে তীরস্থ হইয়াছেন; তখন পূর্ব্ব শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া, পূর্ব্বাভিমান জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল পিতৃদর্শন লালসা চরিতার্থ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা সেই বৈরীসঙ্কুল স্থানে প্রবেশ করিয়া পিতার চরণ দর্শন করা তৎকালে তাঁহার পক্ষে গুরুতর চিন্তার

কারণ হওয়ায়, বন্ধুবর্গের পরামর্শ মত আত্মরক্ষার উপযুক্ত কতিপয়মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে নিঃশঙ্কচিত্তে বৈদ্যবাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সঙ্গিগণকে স্থানান্তরে রাখিয়া, একা পূর্ব্ববৎ দীনবেশে ও গললগ্নীকৃত বাসে পিতৃ-দর্শনে গমন করিলেন। মহেন্দ্র পিতৃদর্শনে আসিয়াছেন, এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে, পুত্রের প্রতি পিতার কিরূপ আচরণ দেখিবার জন্য বৈদ্যবাটীবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা দলে দলে আসিয়া জনতাপূর্ণ করিল।

কর্ত্তা তখন মুমূর্ষু অবস্থায় রুগ্ন শয্যায় শায়িত। কতিপয় মাত্র চিকিৎসক, পারিষদ, অমাত্য, বান্ধব, আত্মীয় এবং পুত্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, পীড়ার যন্ত্রনা ভোগ করিতেছিলেন। সেই সময়, জনৈক ভৃত্যপ্রমুখাৎ মহেন্দ্রনাথের আগমন এবং দর্শনার্থী লোকের জনতার কথা আকর্ণন করায়, সেই অব্যক্ত মৃত্যুযন্ত্রনার মধ্যেও যেন কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন। দীপ, নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার সতেজে প্রজ্বলিত হয়, দ্বারিকানাথও সেই মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তদ্রূপ প্রফুল্লচিত্ত হইলেন। এবং মৃদুমন্দ শব্দে কয়েকবার মহেন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শীঘ্র আনিবার জন্য ভৃত্যের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই আদেশ অনুসারে মহেন্দ্রনাথ পিতার সন্নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পিতা পুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ বড়ই শোকাবহ। দীর্ঘকাল পরে হারাপুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার বিচ্ছেদসন্তাপ আরও উথলিয়া উঠিল এবং নয়ন দিয়া দর দর বেগে বিষাদাশ্রু প্রবাহিত হইতে

লাগিল। পুত্রও পিতৃচরণে লুণ্ঠিত হওতঃ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য বড়ই শোচনীয়, বড়ই মর্ম্মভেদী! সে দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গেল!!

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, পিতা, পুত্রের অনুপস্থিত সময়ের সংক্ষেপে পরিচয় গ্রহণ করিলেন। মহেন্দ্রনাথের অসাধারণ সহিষ্ণুতা, অমানুষিক ক্ষমতা এবং অসহনীয় ক্লেশের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল। এবং শোক,দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, লজ্জা, ভয়, অনুতাপ, পরিতাপ যুগপৎ আসিয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিল। অনন্তর উচ্ছসিত শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক পুত্রের শিরঃঘ্রাণ করতঃ কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

পীড়িতাবস্থায় দ্বারিকানাথ বাবু যে "উইল" করিয়াছিলেন, তাহাতে জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আদৌ কোন কথা উল্লেখ না থাকায়, উক্ত উইল এক্ষণে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে, নিজ বিশ্বস্ত অনুচর "শিবু খানসামার" প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করতঃ শীঘ্র সেই উইল আনিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু কর্ত্তার মুমূর্ষু অবস্থা দৃষ্টি করিয়া কেহ বলিল যে "জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি মোহ পরতন্ত্র হইয়া কর্ত্তা উইল আনিতে হুকুম করিতেছেন," কেহবা ব্যঙ্গচ্ছলে বলিল "কর্ত্তা এখন খেয়াল দেখিতেছেন"; ফলতঃ, সে কথায় কেহই বিশিষ্টরূপ কর্ণপাত করিল না।

আসন্নমৃত দ্বারিকানাথ তাহা বুঝিতে পারিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, এবং কাল বিলম্ব অকর্ত্তব্য বোধে, সমবেত আত্মীয় স্বজন ও দর্শক

মণ্ডলীর সমক্ষে জাহ্নবী তীরে, স্বীয় হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এই মাত্র বলিলেন যে "আজ হইতে আমার কৃত উইল নামঞ্জুর হইল। আমার যাবদীয় স্থাবর, অস্থাবর, ভূমি ও ধন সম্পত্তি অদ্য হইতে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া আমার পঞ্চপুত্র তুল্যাংশে উত্তরাধিকারী হইলেন"। এই বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। ক্ষীণ দেহে অতি-রিক্ত ক্রোধের উদ্রেক হওয়ায় তিনি চেতনা হারাইলেন। পার্শ্বচরগণের অনেক চেষ্টায়, অনেকক্ষণ পরে, যখন বহুকষ্টে মূর্চ্ছাপনোদন হইল, তখন শ্বাস প্রায় কণ্ঠাগত হইয়া-ছিল। সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণ হাত ধরিয়া বসিয়াছিলেন—দেখিলেন নাড়ী বড় ক্ষীণ, বড়ই চঞ্চল, কখন আছে কখন আদৌ অনু-ভব হয় না। তখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া পতিতো-দ্ধারিণী জাহ্নবী গর্ভে নীত করা হইল।

সেই সময় চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহলধ্বনি পড়িয়া গেল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও পৌরজনবর্গের বিকট চীৎকার-ধ্বনিতে এবং পুত্রগণের করুণ আর্ত্তনাদে বিমান নিনাদিত হইতে লাগিল। পরিশেষে পিতার আসন্ন মৃত্যু স্থির করিয়া, তাঁহার পরমার্থিক কার্য্যের জন্য, সুযোগ্য আত্মজগণেরা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া, কেহবা গঙ্গামৃত্তিকায় তাঁহার দেহে "হরিনাম" অঙ্কিত করিতে লাগিলেন, কেহবা তাঁহার কর্ণ-বিবরে হরিনামামৃত শুনাইতে লাগিলেন। কত আত্মীয় স্বজনেরা মিলিত হইয়া "হরিবোল ধ্বনি" দিতে লাগিল। কত বৈষ্ণব দলে দলে আসিয়া "হরিগুণ" সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। কত লোকে বলিতে লাগিল "অন্তে গঙ্গে নারায়ণ

ব্রহ্ম বল"। দেখিতে দেখিতে দ্বারিকানাথের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থায়, পবিত্র সলিলা ভাগীরথী তীরে, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পুত্র ও পৌর-জন বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, পত্নীদ্বয়কে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া, বিষয়বাসনায় ইহজন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া জাজ্বল্যমান সংসারধাম পরিত্যাগ করতঃ প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র-চেতা পুণ্যবান দ্বারিকানাথের ক্ষুদ্রতম আত্মা, যাহা এতদিন এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটী উজ্জ্বল "ধ্রুবতারার" ন্যায় দীপ্তি দান করিতেছিল, তাহা পঞ্চান্ন বৎসর পাঁচ মাস মাত্র বয়ঃক্রমকালে ও বঙ্গাব্দ ১২১৭ সালের শ্রাবণ মাসে, অনন্তধামে বিলীন হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"শর্করা শতভাবেনোপার্জ্জিতং নিম্ব পাদপং।
পয়সা সিঞ্চতে নিত্যং ন নিম্ব মধুবায়তে" ॥

দ্বারিকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া লইয়া অনেক বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল। কেহবা ব্রজনাথ বাবুর পক্ষ অবলম্বন করিলেন, কেহবা মহেন্দ্রনাথ বাবুর পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, ফলতঃ, এস্থলে তদ্বিস্তারিত বর্ণন বাহুল্য। পরিশেষে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথের দ্বারায় অগ্নি সংস্কার কার্য্য সর্ব্ববাদি সম্মত বোধে তাহাই সম্পাদিত হইল।

দ্বারিকানাথ বাবুর মৃত্যু ও মহেন্দ্রনাথ বাবুর আগমন

লইয়া দেশে দিনকতক হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, দ্বারিকানাথ বাবু যেরূপ অবস্থার লোক ছিলেন, সেরূপ সমারোহে যে তাঁহার শ্রাদ্ধশান্তি হইয়াছিল, এমত প্রতীতি হয় না। কারণ, তিনি তাঁহার কৃত উইলে যে ভ্রাতৃবিরোধাগ্নি নিহিত করিয়া যান, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পরক্ষণ হইতেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রামরাবণের সংগ্রামে যেমন "সপ্তরাত্র দিবা যুদ্ধ বাজিতং কোটী ঘটীকং", ইহাঁদের মধ্যেও সেইরূপ কয়েক দিবস ধরিয়া ঘোরতর মারামারী ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিযাছিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথকে, সেই উইলের বলে, তদীয় বৈমাত্রভ্রাতা ব্রজনাথ, পৈতৃক সম্পত্তি হইতে নৈরাশ করিবার ইচ্ছাই সেই বিরোধের আমূল কারণ। কেননা কর্ত্তার উইলে ব্রজনাথকেই সমুদায় সম্পত্তির কর্তৃত্ব দেওয়া ছিল এবং অন্য তিন পুত্র রাধানাথ, শ্রীনাথ ও যদুনাথের প্রতি বিভিন্ন নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকে, কিন্তু মহেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আদৌ কোন কথা উল্লেখ ছিল না। সেই হইতেই ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হইল। কর্ত্তার বাচনিক আদেশ পালন করিয়া নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দেওয়া সাধারণতঃ সুলভ নহে, সুতরাং, ব্রজনাথ সেই উইলের বল অবলম্বন করিয়া পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির এক কপর্দ্দক মাত্র মহেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিতে দিলেন না। তখন মহেন্দ্রনাথ অনন্যোপায় হইয়া মহানগরী কলিকাতায় তাঁহাদের যে পৈতৃক রেশমের ও মরিচের কুটী ছিল, তাহার কৃতাংশ করিবার উপলক্ষ করিয়া, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে উক্ত উইল রদের ইকুইটীর

(Equity) মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলেন। ইকুইটীর মোকর্দ্দমায় লোকের যেপ্রকার সর্ব্বনাশ ঘটে, তাহা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন। ইহাঁদের পক্ষেও তাহার কোনরূপ অন্যথাচরণ হইল না।

জনরবে প্রকাশ পায় যে, দ্বারিকানাথ বাবু বিংশতি লক্ষ নগদ মুদ্রা রাখিয়া যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রজনাথ ভ্রাতৃবঞ্চনা করিয়া তাহা নির্ব্বিরোধে ভোগ দখল করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই। মামলা মোকর্দ্দমা উপলক্ষ করিয়া অধিকাংশ ধনরাশী নিঃশেষিত হইয়া যায়। অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও ধনলোভী আত্মীয় স্বজনগণের করাল গ্রাসে নিধনপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারাও আপনাপন স্বার্থসাধন করিয়া আঢ্যসমাজে পরিগণিত হন।

ধনস্বামী যে অপরিমেয় কষ্টে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে এবং অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে অতুল ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়া যান, তাহা তাঁহার সন্তানগণ পরমসুখে ভোগ দখল করিতে না পারা অপেক্ষা আর অধিক পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? মহেন্দ্রনাথ যে বেশে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, যে "ধুতি ও দোরজা" অবলম্বন করিয়া তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন, যেরূপ দীনবেশে পিতার পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ দীনবেশে দরিদ্রভাবে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে অবস্থাতেও মহানগরী কলিকাতার অনেকানেক ভাগ্যধর পুরুষের নিকট সাহানুভূতি প্রাপ্ত হইতে তিনি বঞ্চিত হন নাই। রাজা গোপীমোহন দেব, বাবু গোপী-

মোহন ঠাকুর, বাবু নিলমনি মল্লিক ও বৈষ্ণবচরণ মল্লিক প্রভৃতি মহোদয়গণ সকলেই তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহার্য্য ও উৎসাহ দানে অগ্রসর ছিলেন। অবশেষে সুবর্ন-বর্ণিক কুলের শীর্ষক শেষোক্ত ধনকুবের মহাত্মাদ্বয় তাঁহাকে মোকর্দ্দমা খরচেব আনুকূল্যার্থে এককালে লক্ষমুদ্রা অর্পণ করেন এবং এই মাত্র বলিয়া দেন যে "যদি তুমি পৈতৃক ধনসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হও, তবে আমাদেব টাকা প্রত্যর্পণ কবিও, নচেৎ অদ্য হইতে উক্ত টাকায় আমাদেব কোন দাবি দাওয়া রহিল না। মনে ভাবিব যে ঐ টাকা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছি"। আহা! কি দযা, কি ধর্ম্ম।! একালে তাহাব সহস্রাংশের একাংশ কোথাও থাকিলে শ্লাঘাব আব পরিসীমা থাকে না। কিন্তু সেকালে এরূপ মহতী পবোপকাব কবিয়াও তাঁহারা স্পর্দ্ধা প্রকাশ কবিতেন না। সেইসকল পূণ্যবলে, অধুনা সেই বংশোদ্ভব মহাত্মাগণ, বাজধানী কলিকাতার ধনাঢ্য-সমাজে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সহকাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন।

মহেন্দ্রনাথ এই সহায় বলে, সুপ্রিম কোর্টে তুমুল মোকর্দ্দমা করিয়া, বিচাবে জয়লাভ কবতঃ উইল নামঞ্জুর ও পিতার বাচনিক আদেশ বাহাল কবিলেন এবং তদনুসারে পিতৃন্যস্ত যাবতীয় সম্পত্তি পাঁচঅংশে বিভাগ করিয়া নিজের ও কনিষ্ঠ সহোদর রাধানাথ বাবুর অংশ পৃথকরূপে চিহ্নিত করিয়া লইলেন। "নহি সুখং দুঃখৈ বিনা লভ্যতে" তদনন্তর সিঙ্গুরে আগমন কবতঃ পৈতৃক ভদ্রাসন বাটীর মধ্যে স্বীয় চিহ্নিত খণ্ডে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, অসময়ের পরম

বন্ধু সেই মল্লিক মহোদয়গণের ঋণ, ব্যাজ সমেত পরিশোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কৃত উপকারের জন্য তিনি আজীবন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ক্রটী করেন নাই।

মহেন্দ্রনাথ বাবুর দুই সংসার। প্রথম পত্নী একটী পুত্র-সন্তান রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথম সংসারে নরেন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় সংসারে ধর্ম্মদাস ও গুরুদাস নামে দুই পুত্র তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। নরেন্দ্রনাথ, পিতার মৃত্যু সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, কিন্তু পিতার লোকান্তে বৈমাত্র ভ্রাতাগণের সহিত পৃথক হন। ধর্ম্মদাস ও গুরুদাসের তৎকালে অত্যন্ত শৈশব অবস্থা।

মহেন্দ্রনাথ বাবুর তিন পুত্রের মধ্যে আদ্যদ্বয় নিঃসন্তানে পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ গুরুদাস বাবুর একপুত্র "প্রমথনাথ" নামে অভিহিত হয়।

রাধানাথ বাবুর এক সংসারে দেবেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহারাই তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। দেবেন্দ্রনাথের প্রাপ্ত বয়সে, যোগেন্দ্রনাথের পঠদ্দশায় এবং মথুরানাথের শৈশবাবস্থায় রাধানাথ বাবুর মৃত্যু হয়। ঐ তিন সহোদরের আদ্যদ্বয় নিঃসন্তানে পরলোকগত হইয়াছেন। মথুরানাথ বাবু জীবিত আছেন এবং তাঁহার দুই পুত্র মন্মথনাথ ও অনাথ-নাথের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিবাহিত অবস্থায় একটী কন্যাসন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাধানাথ বাবু জ্যেষ্ঠ সহোদবের সহিত একযোগে বরাবর বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও নিরীহ লোক ছিলেন। "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা" ইহা নিবন্তর তাঁহার মনোমধ্যে জাগরুক থাকিত এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার অচল ভক্তি ও সমুচিত শ্রদ্ধার ভূরি ভূবি প্রমাণ সর্ব্বদাই দৃষ্টি-গোচর হইত। মহেন্দ্রনাথও কনিষ্ঠ সহোদব ব্যতীত এজগতে আর কোন স্নেহাধাব বস্তু আছে বলিয়া জানিতেন না। এবং সংসারের সকল ভার কনিষ্ঠের প্রতি অপর্ণ কবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তবে কোন গুরুতব বিষয় উপস্থিত হইলে, উভয় ভ্রাতায় তাহা পরামর্শমতে সম্পাদন করিতেন।

ক্রমে পৈতৃক ভদ্রাসনে বৈমাত্র ভ্রাতাগণেব সহিত এক-যোগে বসবাসে নানাপ্রকাব কলহ আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। কথায় বলে "এক কম্বলে দুইজন ফকির সুখে বাস করিতে পারে, কিন্তু এক রাজ্যে দুইজন রাজার সমবেশ হয় না।" ইহা অযথা নহে। অগত্যায় মহেন্দ্রনাথ বাবু ও রাধানাথ বাবু উভয় সহোদবে সিঙ্গুর পবগণাব বর্দ্ধমান রাজ বাটীর জমিদারী "লাট জলাঘাটা" পত্তনি গ্রহণ করিয়া, উহার মধ্যে বসবাসেব কারণ বাটী নির্ম্মানার্থে এক চত্তরে এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমিব আয়তন করিয়া, তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও উত্তর সীমানায় বিস্তৃত গড় খাদ খনন, এবং পশ্চিম দিকে সুশোভিত প্রাচীর ও রেলিং এবং মধ্যস্থলে দুইটী গেট নির্ম্মাণ করাইয়া, বাটীর সীমা নির্দ্ধারণ ও সূত্রপাত করিলেন। সিংহদ্বারের উত্তর দক্ষিণ দুই ধারে যে সুবিস্তৃত পুষ্করিণী খনন হয়, তাহার মধ্যে উত্তরদিগেরটী অতিশয় বৃহৎ। তাহার

উত্তর ধারে "গোল ঘাট" চাঁদনি, সুখসেব্য হাওয়াখানা (পাকা আটচালা), মনোহর পুষ্পোদ্যান, তাহাব পূর্ব্বধারে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু, পিচ, গোলাপ জাম প্রভৃতি নানা প্রকার সুস্বাদু ফলেব বৃক্ষ, পশ্চিমে "সপ্ত শিবালয়", পূর্ব্বধারে দেবালয় অর্থাৎ ঠাকুরবাটী, সদাব্রতবাটী এবং বসবাসের কাবণ দ্বিখণ্ড অন্দব এবং সদব "চক্ মিলান" দ্বিতল অট্টালিকা এবং মনোহব পূজাব দালান নির্ম্মাণ কবিয়া উভয় সহোদরে তথায় বসবাস কবিতে লাগিলেন।

ব্রজনাথ, শ্রীনাথ, যদুনাথ বাবু যদিও এক গর্ভজাত তিন সহোদর ছিলেন কিন্তু তাঁহাদেব পরস্পর মনোমালিন্যতা প্রযুক্ত সকলেই একে একে পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতে লাগিলেন।

ব্রজনাথ বাবু সিঙ্গুরের অনতিদূরস্থ ঘনেস্যামপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে দীর্ঘাকার গড়বাটীর আযতন করিয়া তিন চারিটী পুষ্করিণী খনন ও অন্দর সদর, পূজার দালান, ঠাকুরবাটী প্রভৃতি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসবাস করিতে লাগিলেন। পৈতৃক সম্পত্তির সাহার্য্য অনেক টাকা আয়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি জীবনের মধ্য-দশায় ঋণগ্রস্ত হয়েন এবং সেই দায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারায়, বিষয়চ্যুত হওতঃ শেষদশায় অতিশয় মনোকষ্টে জীবনযাপন করিয়া ১২৫২ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ, তাঁহার বর্ত্তমানে বিবাহিত অবস্থায় নিঃসন্তানে পরলোক গমন করেন। অব-

শিষ্ট চারি পুত্র নবদ্বীপনাথ, কিশোরিনাথ, কৃষ্ণনাথ ও প্যারিনাথ তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। তন্মধ্যে কিশোরিনাথ ও কৃষ্ণনাথ বাবু বর্ত্তমান আছেন। নবদ্বীপ নাথ বাবুর দুই পুত্র কেদারনাথ ও নগেন্দ্রনাথ এবং কিশোরিনাথ বাবুর এক পুত্র গোলকনাথ ভিন্ন সকলেই নিঃসন্তান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"যদুপতে কঃ গতা মথুরাপুরী রঘুপতে কঃ গতোত্তর কোশল।
ইতি বিচিন্ত কুরুস্ব মনঃ স্থিরং নসদিদং জগদিত্য বধারয়" ॥

শ্রীনাথ বাবুর বসবাসের কোন নির্দ্ধারিত স্থান ছিল না। তিনি প্রথমে সিঙ্গুরের বাজারের পশ্চিম কিশমত অপূর্ব্বপুর নামক গ্রামে, প্রায় দুইশত বিঘা ভূমি ঘেরাও করিয়া গড় খাদ খনন এবং "হাওয়া খানা" প্রস্তুত করেন। অদ্যাবধি সে স্থান "নবাব বাবুর গড়" নামে খ্যাত আছে। তথায় অল্পদিন অবস্থান করিয়া হুগলীর ঘুটে বাজারে, প্রতাপপুরে, চুঁচড়ার বারিকের মাঠে, হুগলীর ধর্ম্মপুরে এবং কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে বিবিধপ্রকার অট্টালিকা নির্ম্মাণ দ্বারায় যথেচ্ছামত বাস করিতেন। ইহাঁর প্রকৃতি, চাল চলন, এবং ধরণ ধারণ দেখিলে, যেন একজন স্বাধীন রাজার ন্যায় বোধ হইত।

ইহাঁর সমকালীন অনেক রাজা ও জমীদারগণের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্যভাব ছিল। এমন কি! বর্দ্ধমানের মহারাজ

প্রতাপ্‌চান্দ্‌ বাহাদুরের সহিত বিশেষ সখ্যতা থাকায়, তখনকার রাজপ্রথানুসারে পরস্পর "পাগড়ী" বদলাই পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হয়।

তাঁহার অসামান্য বদান্যভাব এবং বাবুগিরীর বিস্তারিত বর্ণনা অতীব বাহুল্য। তিনি দ্বারিকানাথ বাবুর চতুর্থ পুত্র বলিয়া প্রথমতঃ "ন বাবু" নামে খ্যাত ছিলেন, ক্রমে তাঁহার অমানুষিক কার্য্যকলাপ ও অপরিমিত ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া, সকলেই তাঁহাকে "নবাব বাবু" নামে সম্বোধন করিত। এবং সেই নামেই তিনি বঙ্গদেশে ও বঙ্গসন্তানগণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম এতদ্দেশে অতি অল্প লোকই জ্ঞাত আছেন।

যখন "নবাব বাবু" তীর্থ পর্য্যটন বাসনায় কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে "টেকারির মহারাজ" তথায় অবস্থান করিতেন। একদিন মহারাজ হস্তী আরোহণে নগর ভ্রমণে বহির্গত হন, সেই সময় নবাব বাবু অশ্বারূঢ় হইয়া, সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। পরস্পরের পারিষদ ও দেহরক্ষক লোকের অভাব ছিল না। দৈবগতিকে অশ্ব দর্শনে হস্তী উন্মত্ত হওয়ায়, রাজা বাহাদুরের সহিত "নবাব বাবুর" পথিমধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। এবং সেই সামান্য বিষয় উপলক্ষ করিয়া, পরস্পর এতদূর ক্রোধ পরতন্ত্র হয়েন, যে তথা হইতে আপনাপন বাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সুসজ্জিভূত হওতঃ ঘোরতর দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইতে উদ্যোগী হইলেন। এই সংবাদ যথাসময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া

পরস্পরের অকারণ মনোমালিন্য দূরীভূত করতঃ বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়া দেন। তাহার পর হইতে তাঁহারা উভয়ে পরম সদ্ভাবে কিছুদিন কাশীধামে অবস্থান করতঃ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার অভেদাত্মা ছিল। নবাব বাবু যখন কলিকাতায় থাকিতেন, তখন উক্ত মহাত্মা তাঁহার সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ এবং একত্রে আমোদপ্রমোদে কালযাপন করিতেন।

তদ্ভিন্ন তাঁহার দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে এতদ্দেশের লোক সর্ব্বদাই শশঙ্কিত থাকিত। এমন কি! জেলার জজ মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত তাঁহার অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবাব বাবু যে সময় হুগলীর বারিকের মাঠের বাটীতে অবস্থান করিতেন, তৎকালে স্মিথ্ সাহেব হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সহিত কোন তুচ্ছ বিষয়ে নবাব বাবুর মনোবাদ ঘটায়, সেই কারণে ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া একদিন বল পূর্ব্বক তাঁহার পত্নীকে গাড়ী হইতে ছিনাইয়া লইয়া পাঁচ সাত দিবস বন্দিভাবে নিজালয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সাহেব, দুরপনেয় কলঙ্কের ভয়ে, তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া, তাঁহার শরণাগত হইলে মেম সাহেবকে প্রত্যর্পণ করেন। তাহার অল্পদিন পরে স্মীথ্ সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণান্তর সস্ত্রীক বিলাত গমন করেন এবং কিছু দিবস তথায় অবস্থান করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ পদে নিযুক্ত হয়েন। সেই অবস্থায় তিনি নবাব বাবুর প্রতি পূর্ব্বরাগের প্রতিশোধার্থে ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগি-

লেন। কিন্তু সহসা কিছুতেই স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধ করিতে না পারিয়া, অবশেষে একটা মিথ্যা ডাকাতি মোকর্দ্দমা উপলক্ষে, কতকগুলি বদমাইস লোকের সহিত নবাব বাবুর উপরও কল্পিত চৌর্য্যাপরাধ আরোপণ করিয়া, তাঁহাকে সাত বৎসর কারারুদ্ধ করেন। আপিল আদালতে যদিও সে হুকুম খণ্ডন হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার দুর্দ্দণ্ড স্বভাবের কথা প্রকাশ থাকায়, তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডাই হইতে হয়। সে অবস্থায়ও জেলখানার মধ্যে তাঁহার বাবুগিরী ও ধূমধামের হ্রাস পায় নাই। তাঁহার শরীর রক্ষার্থে ষোল জন মোগল অশ্বারোহী সর্ব্বদাই হাজির থাকিত; এবং দশজন "খানসামা" অনবরত তাঁহার বেশবিন্যাস ও সেবা শুশ্রূষা করিত। তৎসওয়ায় জমাদার, চোপদার, বরকন্দাজ, নকীব, আশা শোটাধারী অমাত্য, পারিষদ প্রভৃতি একজন স্বাধীন রাজার আদব কায়দায় হামেহাল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত।

নবাব বাবুর ন্যায় রূপবান পুরুষ তৎকালে এতদ্দেশে প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। তাঁহার লাবণ্যময় অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া অনেক ইংরাজ ও ইহুদী অবাক্ হইয়া থাকিত। তিনি যে সময় জলযান সহকারে বিশেষ ধূমধামের সহিত কাশীধাম যাত্রা করেন, সেই সময় পথিমধ্যে বিলাতি সৈন্যের "বহরের" সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের বহর, গুণ টানিয়া কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছিল, এবং ইহাঁর নৌকাগুলি অনুকূল বায়ু প্রভাবে "পালী ভরে" গঙ্গাবক্ষ আলোড়িত করিয়া তর তর বেগে বাহিয়া যাইতেছিল। এমন সময়, তাহাদের নৌকার

গুণ, ইহাঁর "পালিতে" লাগিয়া বজবা ঘুবিয়া গেল। নবাব বাবু তাহাতে কোপান্বিত হইয়া ঐ গুণ কাটিয়া দিতে হুকুম দেন। তদনুসাবে অনুচববর্গেবা তাহা কাটিয়া দিলে, সেই সংবাদ তাহাদেব প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন সাহেবেব কর্ণ-গোচর হয। সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ বজবাব কর্ত্তৃপক্ষকে ধৃত কবিযা আনিবাব জন্য ষোল জন গোবা সৈন্য একখানি "জেলি বোটে" প্রেবণ কবেন। যে বজবায় নবাব বাবু ছিলেন, গোরাবা তথায উপস্থিত হইযা কাপ্তেন সাহেবেব হুকুম জানাইল। তখন কোম্পানিব বাজ্যে তাহাদেব সৈন্যগণের সহিত সহসা বিবাদ কবা অযুক্তি বোধে, সাহেবেব হুকুমমত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদেব সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে তাঁহাব পবিচ্ছদেব বিশেষ কোন পারিপাট্য ছিল না। কেবল মাত্র একখানি ঢাকাই ধুতি ও ঢাকা মজলিনেব আংরাখা গাত্রে শোভা পাইতেছিল। সেকালের জবিব ঝ্যাৎলা পাদুকা পাযে ছিল, মস্তকেব কুঞ্চিত কেশবাজী সুন্দররূপে বিন্যস্ত ছিল। তাঁহাব গোঁপ যোড়াটী সহসা তুলি দিয়া আঁকা বোধ হইত এবং তপ্ত কাঞ্চনেব ন্যায় উজ্জল গৌরাঙ্গমূর্ত্তি, মানব মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। সেই অবস্থায় হস্তে একটী 'সেতার" (তৎকালে বাজাইতেছিলেন) লইযা, অকুতোভয়ে সেই গোবাদিগেব সহিত "জেলি" বোটে আরোহণ করতঃ একা সাহেবের নিকট আসিযা উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন যদিও প্রথমে অত্যন্ত বাগ প্রকাশ কবেন, কিন্তু তাঁহার সুমিষ্ট বাক্চাতুবী ও সুন্দব রূপমাধুবী দেখিয়া, সে ক্রোধ শীঘ্রই তিরোহিত হইয়া যায়। এবং উর্দ্দু ভাষায় এই মাত্র

বলেন, যে "তুমি যে প্রকার গুরুতর অপবাধ করিয়াছ, তাহাতে তোমার শিবচ্ছেদ কবা আইন সঙ্গত ও কর্ত্তব্য কার্য্য ; কিন্তু, তোমাব চেহাবা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বোধ হয, খোদা তোমাকে এই দুনিযাব মধ্যে "নুব পয়দাইশ" করিয়াছেন। তোমাব শিবচ্ছেদ কবিলে জগৎ অন্ধকাব হইবে। এজন্য আজ তোমাব শিব "এনায়েৎ" কবিলাম। ফলতঃ, এরূপ অসমসাহসিক কার্য্য আব কখন কবিও না। তোমাব সেতাব বাজনা শুনিতে ইচ্ছা কবি"। তিনি তৎকালে সেতাবে একজন অদ্বিতীয লোক ছিলেন এবং সেতার বাজনা শুনাইয়া সাহেবকে অধিকতব সন্তোষ কবিয়া দিলেন। আসিবাব সময সাহেব তাঁহাব কথঞ্চিৎ পবিচয় প্রাপ্ত হইযা " সেকহ্যাণ্ড " কবতঃ বিদায় দান কবিলেন।

নবাব বাবু যে সময "চুচুডায" অবস্থান কবিতেন, তখন তথায কার্ত্তিক পূজায় মহা সমারোহ হইত। অপরাপর বাহ্যিক বহ্বাড়ম্বর ব্যতীত বিসর্জ্জনেব সময়, সকল প্রতিমূর্ত্তি একত্রে সমবেত হইলে, আকৃতির উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা বিচাবে কোন পক্ষেব জয় এবং কোন পক্ষেব পরাজয় নির্দ্ধারিত হইত। সেই জন্য, অনেকেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির সাদৃশ্য লইয়া, কার্ত্তিক প্রতিমা গঠন কবতঃ জয়লাভ করিত। তাঁহার অনাবৃত দেহ ও কুঞ্চিৎ কেশরাজী সহসা দৃষ্টি করিলে, দেবলোক বলিয়া অনুমিত হইত।

তিনি একজন স্বাধীনচেতা অথচ অমিতব্যয়ী লোক ছিলেন। এক বৎসর দোলযাত্রা উপলক্ষে মহারাজ প্রতাপ চন্দ্ বাহাদুব তাঁহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়া

পাঠান। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের" আদৌ সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং হস্তি, অশ্ব, পাল্কি প্রভৃতির দ্বারা বর্দ্ধমান গমনাগমন বড়ই কষ্টকর ছিল; কিন্তু, মহারাজের সহিত বিশেষ সদ্ভাব থাকায়, অগত্যা তাঁহাকে নানা কষ্ট সহ্য করিয়াও যথা সময়ে রাজধানী উপনীত হইতে হইল। বর্দ্ধমানে অষ্টাহ "হুলির" বড় ধূম হইত। রাজ-বাটীর তো কথাই নাই; এমন কি, সদর রাস্তারও স্থানে স্থানে রাশি রাশি আবির পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। বিশেষতঃ সে বৎসর নবাব বাবুর আগমনে, মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রোষনাই, বাজী, নাচ, তামাসা প্রভৃতি নানা প্রকার সতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে উৎসবের দিন সংক্ষেপ হইল, তত্রাপি "আবিরের" আমদানি না হওয়ায়, মহারাজ উৎকণ্ঠিত হইয়া কলিকাতার কর্ম্মচারীর নিকট শীঘ্র আবির প্রেরণ করিবার জন্য কড়া হুকুম প্রেরণ করি-লেন। প্রত্যুত্তরে তথাকার কর্ম্মচারী লিখিয়া পাঠাইল, যে "কলিকাতা সহরে যে কয়জন আবিরের মহাজন আছে ও যেখানে যত আবিরের আমদানি হইয়াছিল, সকলই সিঙ্গুরের নবাব-বাবুর লোক বায়না করিয়া গিয়াছে। সেই সকল মাল অদ্যাপি দোকানে মজুত আছে, কিন্তু তাঁহার বিনানুমতিতে কেহই বিক্রয় করিতে চাহে না। এমতে হুজুর আলির যেমত মর্জ্জি হয়"।

পত্রে শুনিয়া মহারাজ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তখন নবাব বাবু তাঁহার লজ্জিত ভাব অবলোকন করতঃ সেই সকল আবির আনাইবার পক্ষে কোন আপত্তি করিলেন না, এবং

তদনুসারে মহারাজ সেই আবির বর্দ্ধমানে আনাইয়া মহা সমারোহে উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। সেই হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ প্রতাপ চন্দ্ বাহাদুর "নবাব বাবুর" সম্বন্ধে কোনরূপ পরিহাস করিতে প্রয়াশ পাইতেন না।

কাসিম বাজারের রাজা হরিনাথ কুমারের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। এমন কি। হরিনাথ কুমারের মৃত্যুর পর যখন বৃদ্ধাবস্থায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতঃ নবাব বাবু বৃন্দাবন বাসের উদ্দেশে মুরসিদাবাদ দিয়া গমন করেন, তখনও তাঁহার পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ কুমার বাহাদুর, জনৈক ভৃত্য প্রমুখাৎ তাঁহার আগমন বার্ত্তা অবগত হওতঃ পিতৃবন্ধু বলিয়া, যথোচিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক রাজবাটীতে লইয়া গিয়া, সেই খানেই তাঁহার অবস্থানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু পূর্ব্ব সুখভোগের পর, বিষয় বৈভব চ্যুত হওয়ায়, সংসারের প্রতি তাঁহার বিষদৃশ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; এবং তদবধি ঐহিক ভোগ লালসা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সুতরাং সে অবস্থায় আর পূর্ব্বপ্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, একজন সামান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় জনৈক মটধারির "অস্থলে" আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাচ, রাজা কৃষ্ণনাথ কুমার তাঁহার প্রতি যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি না করিয়া, সেই "অস্থলেও" তাঁহার জন্য রাজভোগ্য আহারীয় নিত্য নিত্য প্রেরণ করিতেন।

যে সময় "জাল প্রতাপ চন্দের" মোকর্দ্দমা লইয়া, দেশে

হুলুস্থূল পড়িয়া যায়, সেই সময় কলিকাতার কতিপয় বড় লোক এবং এই নবাব বাবুই "জাল রাজার" অন্যতম সাহায্যকারী ছিলেন, এবং তজ্জন্য অনর্থক প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া শেষদশায় অত্যন্ত মনোকষ্টে দিনযাপন করেন।

দুঃখের বিষয় যে নবাব বাবু অপরিমিত ব্যয়ে এবং অতিরিক্ত দান ধ্যানে জীবদ্দশাতেই সমস্ত বিষয়চ্যুত হন। এবং বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৃন্দাবন বাসের উদ্যোগ করেন, কিন্তু নৃশংস কাল তাঁহার সে অভিলাষ পূরণ করিতে দিল না। পথিমধ্যে মুর্শীদাবাদেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং রাজা কৃষ্ণনাথ কুমার বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রীত্যনুসারে তাঁহার সমাধি দেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, একারণ তাঁহাদের পুরোহিতের দৌহিত্র মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক কুলিন ব্রাহ্মণসন্তানকে ভিক্ষাপুত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকেই বাৎসল্য স্নেহে লালনপালন করিয়াছিলেন।

নবাব বাবুর মৃত্যুর পর, যখন তাঁহার পত্নী বৃন্দাবনধামে অবস্থান করেন, তখন উক্ত মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ মহাতাপ্ চন্দ্ বাহাদুরের প্রিয় পারিষদরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এবং সেই অবস্থায় স্বীয় প্রতিপালকজননীর এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থান্তর ঘটনার সংবাদ অবগত হওতঃ অত্যন্ত কাতর হইয়া, তাঁহার দুঃখ অপনোদনার্থে মহারাজকে অনুরোধ করেন। আজ লিখিতে লজ্জা করে, যে নবাব বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি হিন্দুদিগের প্রত্যেক তীর্থস্থানে অদ্যাবধি বিরাজমান, তাঁহারই

পত্নী রাজ রাজেশ্বরী ইন্দ্রাণী হইয়া, শেষদশায় বর্দ্ধমানরাজের তঙ্কাভোগী হওতঃ বৃন্দাবনধামে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

যদুনাথ বাবু সিঙ্গুর পরিত্যাগ করিয়া হুগলীর "ধর্ম্মপুরে" উক্ত প্রকার গড়বাটী নির্ম্মাণ দ্বারায় অবস্থান করেন। তিনি অত্যন্ত বলবান এবং সাহসিক পুরুষ ছিলেন। অশ্বারোহণে তাঁহার অদ্বিতীয় নিপুণতা লক্ষিত হইত। এমন কি! ঘোড়-দৌড়ের সময় রুমাল, টাকা কিম্বা অন্যপ্রকার ক্ষুদ্র দ্রব্য ভূমে নিক্ষেপ করতঃ বিশেষ লক্ষ্য সহকারে তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইতে পারিতেন। ইংরাজ মণ্ডলীতে ইনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; এবং ইংরাজ সেবায় বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া শেষদশায় সর্ব্বস্বান্ত হওতঃ অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সিঙ্গুরের বাবুদের দয়া দাক্ষিণ্যতা গুণে, তদ্দেশবাসী জনগণেরা যে যথেষ্ট উপকৃত হইতেন, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদের অধিকারস্থ প্রজাগণ, রামরাজ্যের ন্যায় পরম সুখে এবং নিরুদ্বেগে জমিদারী মধ্যে বাস করিয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের উন্নতির কামনা করিত। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনে তাঁহারা কখনই পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহাদের অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ যদিও এক্ষণে অনেকের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু উহা অধিক দিনের কথা নয়,

যাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই আমাদের কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

সাধারণের উপকারার্থে নিয়তই তাঁহাদের ভাণ্ডার বিমুক্ত থাকিত। দেশের মধ্যে কাহারও পিতৃমাতৃ অথবা কন্যাদায় উপস্থিত হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব দায় তুল্য জ্ঞান করিয়া, তাহার প্রতিবিধান করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। দোল দুর্গোৎসব, অতিথি সৎকার, দেবসেবা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কাণ্ড, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ নিয়তই যথাযোগ্য ভাবে তাঁহাদের আলয়ে সম্পাদিত হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি প্রতিবাসী এবং ভদ্র সন্তানগণের প্রতি তাঁহা-দের কোন ভিন্নভাব লক্ষিত হইত না। আত্মীয় স্বজন এবং স্বজাতি কুটুম্বগণ সকলেই তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগভাজন ছিলেন। তাঁহাদের অপরিসীম স্নেহ, অকপট দয়া এবং অবারিত দাক্ষিণ্য, সকলের উপর সমভাবে বিরাজমান থাকিত। স্বজাতির দুঃখে তাঁহারা সর্ব্বদাই সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, এবং তাঁহাদের প্রতিপালনে নিয়তই মুক্তহস্ত ছিলেন।

এতদ্দেশের ক্ষত্রিয় জাতিরা দুইটী প্রসিদ্ধ দলে বিভক্ত ছিল। সেই দল "বর্দ্ধমানের রাজমেল" এবং "সিঙ্গুরের বাবুর মেল" নামে কথিত হইত। রাজমেল অপেক্ষা ইহাঁদের দলস্থ ক্ষত্রিয়সংখ্যা অধিক, এবং সিঙ্গুর, পলতাগড়িয়া, কুঞ্জবেড, কলিকাতা, বরাহনগর, হুগলী, বংশবাটী, জগন্নাথ-পুর, ঝিখিরা, খাঁটরা, কেশবপুর, ডিপা, গুপ্তিনগর, জামদাঙ্গা,

ব্রাহ্মণ আড়া, বিজুব, বাণিবন্দ এবং গোলীগ্রাম প্রভৃতি নানা স্থানে ব্যাপৃত ছিল। এই সকল ক্ষত্রিয়বা, তাঁহাদেব দলাধিপতি সিঙ্গুবের বাবুদেব অনুমতি ব্যতিরেকে, বিবাহাদি কোন প্রকার কবণ কাবণ এবং আদান প্রদান কবিতে পাবিতেন না। কাল সহকারে উহাঁদেব অবস্থা ভেদে, ঐ দলেব ঐক্য-গ্রন্থি এক্ষণে শিথিল হইযা পড়িযাছে।

সিঙ্গুবেব বাবুবা গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন উপাধি গ্রহণ কবেন নাই বলিযা, তাঁহাদেব বাজ সম্মানেব অসদ্ভাব ছিল না। ইংবাজী সন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে "লর্ড কর্ণওয়ালিসেব" শাসন-কালে, যখন দশসালা বন্দোবস্ত হয, তখন অন্যান্য জমীদার-গণের সমবর্ত্তী স্বর্গীয় দ্বাবিকানাথ বাবু একজন প্রধান এবং প্রথম শ্রেণীব জমীদার বলিযা গণ্য হইযাছিলেন। কোন ইংবাজ গ্রন্থকাব ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়া, তাঁহাকে সিঙ্গুরের জমীদাব দ্বারিকানাথ সিংহ নামে উল্লেখ করিয়া গিযাছেন।

তাঁহাদেব সভা, বহুবিধ বুধমণ্ডলি পবিবেষ্টিত রাজসভাব ন্যায় সর্ব্বদাই শোভা পাইত। নিসস্ত ও বরখাস্ত (যাহাকে আগম ও নিগম বলে) যথানিয়মে পরিচালিত হইত। পণ্ডিত-বর বনমালি তর্কপঞ্চানন, বামধন ন্যায়ভূষণ, বামকান্ত তর্কালঙ্কার, হবনাবায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত এবং রামকান্ত বিদ্যাবাগীস প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নিয়তই উপস্থিত থাকিয়া সভার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতেন। এবং ইঁহারাও অকাতরে তাঁহাদিগেব চতুষ্পাঠী প্রভৃতির ব্যয় ভার যথাসাধ্য আনুকুল্য কবিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তদ্ভিন্ন নানা দেশ দেশান্তর হইতে অনেক অভ্যাগত ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য্য এবং

গোস্বামীগণের সমাগম হইত এবং তাঁহারাও যথাযোগ্য সমাদরের সহিত বিদায় প্রাপ্ত হইতেন।

সিঙ্গুরে মালিয়া, কালিয়া, জোসী, তিক্কা, মলমিশ্র, সাহরণ প্রভৃতি অনেক সারস্বত ব্রাহ্মণ ও দোবে, চৌবে, পাঠক, তেওয়ারি, উপাধ্যায় প্রভৃতি কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ এবং চট্টোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক রাঢ়শ্রেণী ব্রাহ্মণ বাস কব্তিেন, তাঁহাবা সকলেই কোন না কোন প্রকারে এই সংসারের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অবস্থাপন্ন ও ক্রিয়াবান হইয়া, স্বদেশ মধ্যে সসম্ভ্রমে দিনযাপন কবিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন গিরী, পুরী, ভারতী, গোপব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র (আচার্য্য) অনেকেই এই সংসাবেব শীতল ছায়ায় শান্তিলাভ করিতেন। প্রধান কর্ম্মচারী হইতে অত্যল্প বেতনভোগী চাকর পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল ছিল এবং যে যেরূপ সম্মানের যোগ্য, তাহাকে তদ্রূপ সম্মানের সহিত প্রতিপালন করিতে ইহাঁরা কথনই পরাঙ্মুখ হইতেন না।

দ্বারিকানাথ বাবুর সময়ে শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বর জীউর গদীতে মোহন্ত স্থাপনার প্রথম সূত্রপাত হয় এবং তিনিই তৎকালে হুগলী জেলার মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত জমীদার থাকায়, রাজা মোহনগিরী মোহন্তকে “তিলকদান” করতঃ উক্ত গদীতে অধিষ্ঠিত করেন। তদবধি মোহন্ত মোহনগিরী মহারাজ, তদপরে মোহন্ত রঘুগিরী মহারাজ এবং বর্ত্তমান মোহন্ত মাধবগিরী মহারাজগণ অদ্যাবধি “বাবু বংশাবলীর” নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন না।

দ্বারিকানাথ বাবুর প্রধান কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেকেই কায়স্থজাতি ছিলেন। দেওয়ান রামপ্রসাদ মল্লিক, কারকুন রামসুন্দর সেন, খাজাঞ্চি যুগোল কিশোর বিশ্বাস, মুন্সী গুপীনাথ রায় এবং হেড্‌মোহরার পার্ব্বতীচরণ মল্লিক, ইহাঁরা সকলেই কায়স্থ সমাজে অতীব মর্য্যাদাবন্ত ব্যক্তি এবং জমিদারী কার্য্যে বিশেষ দক্ষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু উঁহাদের কাহারও সিঙ্গুরে বাস না থাকায় স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ বাবু, দেওয়ান রামপ্রসাদ মল্লিককে অন্যূন চল্লিশ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া বসবাস করান। তিনি উক্ত মল্লিককে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন (মল্লিক মহোদয়ের দক্ষতায় বাবুদিগের সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর বাটওয়ারা কার্য্য সুন্দররূপে নিষ্পাদিত হইয়াছিল) এবং সুখ সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে ভিন্ন ভিন্ন জমিদারীর মধ্যে অনেক নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি দান করিয়া যান। অধুনা ঐ সকল লাখরাজভূমির কিয়দংশ উক্ত মল্লিকবংশের করায়ত্তে থাকিয়া, তাঁহাদের দেবসেবা পর্য্যাপ্ত করিতেছে। সুখের বিষয় যে বর্ত্তমানকালে ঈশ্বর প্রসাদাৎ মল্লিকবংশ বিস্তৃত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন পদগ্রহণে দেশের উন্নতিসাধন এবং গৌরব সংরক্ষণ করিতেছেন।

খাজাঞ্চি যুগোলকিশোর বিশ্বাস অত্যন্ত বিশ্বস্ত, ধার্ম্মিক এবং প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারই পুণ্যবলে স্বকীয় সোপার্জ্জিত বিষয়ে সেই বংশাবলীরা বর্ত্তমান কালে স্বদেশে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া বিশেষ সম্রান্তভাবে দিনপাত করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনাথ বিশ্বাস পরম বৈষ্ণব এবং ধর্ম্মভীরু নিরীহ লোক। অদ্যাবধি সিঙ্গুরের বাবু

বংশাবলীব প্রতি তাঁহাব অচল ভক্তিব ভূবি ভূবি প্রমাণ পাওয়া যায়।

তদ্ভিন্ন সিঙ্গুবে বাজপূত, মিত্রমদক, সদ্‌গোপ, পল্লবগোপ, মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতিব বসতি আছে। উহাদেব পূর্ব্বপুরুষেবা যে কোন না কোন বকমে সংস্পৃষ্ট থাকিয়া ঐ সংসাব হইতে প্রতিপালিত হইত, তাহা বলা বাহুল্য।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

" ববং বনং ব্যাঘ্র গজেন্দ্র সেবিতং।
দ্রুমালয পক্ক ফলাম্বু ভক্ষণম্ ॥
তৃণানী শয্যা পবিধান বল্কলং।
ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবনং " ॥

(হিতোপদেশ)

সে কালে সিঙ্গুব অতি বমণীয় স্থান ছিল এবং বাবুদিগের গৌববে বাজধানী বলিযা সর্ব্বত্রেই অভিহিত হইত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহেন্দ্রনাথ বাবু ভুমিষ্ঠ হওয়াবধি সিঙ্গুবেব সৌভাগ্যসূর্য্য খবতবভাবে সমুজ্জ্বলিত হয় এবং তাঁহাবই মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলা বাজলক্ষ্মী চিবদিনেব মত অন্তর্দ্ধ্যান হয়েন। বস্তুতঃ তাহা সম্পূর্ণরূপ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয।

কমলা যখন চঞ্চলা হয়েন, তখন নানাপ্রকার উপলক্ষ আসিয়া মনুষ্যকে ছারখাব কবে। যে মহেন্দ্রনাথ ও রাধানাথ উভয় ভ্রাতায় অভিন্নহৃদয়ে বিশেষ সম্প্রীতির সহিত একান্নভুক্ত

থাকিয়া পরম সুখে সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন, যে মহেন্দ্রনাথ বৈমাত্র ভ্রাতাগণের সহিত কলহে পরাঙ্মুখ হইয়া নিজ কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত একত্রে বসবাস করতঃ পরিণামে সুখী হইবেন আশা করিয়াছিলেন, যিনি কনিষ্ঠ সহোদরকে আপনার প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন বলিয়া, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগকালে নিজাংশ অপেক্ষা তাঁহার অংশে জমিদারীর আয় সমধিক নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, সেই ভ্রাতৃবৎসল ও প্রণয়ী ভ্রাতাদ্বয়ের মধ্যেও এতদিনের পর সামান্য কারণে মনোবাদ আসিয়া দেখা দিল।

একদা শিবপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহেন্দ্রনাথ বাবু কাঙ্গালি বিদায়ের জন্য তাঁহার প্রধান সভাসদ রসিক লাল মালিয়াকে নেতৃত্ব পদে অভিষেক করেন। মালিয়াজী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, বিশ্বস্ত এবং উদারচেতা ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া উক্ত বাবু তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ এবং যথোচিত ভক্তি করিতেন, তাহা আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। এক্ষণে উক্ত কার্য্য যাহাতে সকলের সন্তোষের সহিত নিষ্পন্ন হয়, তজ্জন্য মহেন্দ্রনাথ বাবু কতকগুলি তোড়াবন্দী টাকা মালিয়াজীকে সমর্পণ করিয়া, কতিপয় কর্ম্মচারী তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া দেন। এদিকে এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ায় চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে কাঙ্গালি আসিয়া জনতাপূর্ণ করিতে লাগিল। মালিয়াজী তাহাদের বিদায়ের গোলমালে ব্যস্ত থাকায়, সেই সুযোগে একটী আড়াই শত টাকার তোড়া অন্তর্হিত হইয়া যায়। ক্রমে মালিয়াজী যখন কাঙ্গালি বিদায় কার্য্য সম্পাদনান্তে, যাহার জিম্মায় যত টাকা দিয়াছিলেন, তাহার হিসাব

নিকাশ করিয়া মজুত তহবিল মিলাইলেন, তখন দেখিলেন যে, আড়াই শত টাকার তিনটী তোড়া মজুত থাকার পরিবর্ত্তে দুইটী তোড়া অবশিষ্ট রহিয়াছে। কাহার জিম্মায় এবং কে রক্ষক ছিল, তাহার তদন্ত করায় প্রকাশ পায় যে, তাঁহারই জনৈক আত্মীয় ঐ তোড়া আত্মসাৎ করিয়াছে। তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ঐ তোড়া তাঁহার বাটীতে পোঁছিবামাত্র, কোন রকমে তাহার অর্দ্ধেক টাকা হস্তান্তরিত হয়, অপরার্দ্ধ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা আনিয়া উপস্থিত করিলে, মালিয়াজী ঐ টাকা সমেত কর্ত্তার নিকট গমন করিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। বাবু মহেন্দ্রনাথ তাহা শ্রবণান্তর হাস্য পরিহাস সহকারে কহিলেন, যে "কাঙ্গালি বহুবিধ প্রকারের হয়, তন্মধ্যে ইনি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এ ব্যক্তি আমার সরকারের বেতনভোগী চাকর, নিত্য নিত্য আশানুরূপ প্রতিপালিত হইতেছে, তথাচ লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহা তাহার দুর্ব্বুদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি টাকাতে এতই লোভ জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিলেও তাহার আশা পূর্ণ না হইত, এমত নহে। যাহা হউক, এই টাকা আপনি খাজাঞ্চির নিকট খরবাৎ লেখাইয়া, তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করুন। সরকারে জমা দিবার প্রয়োজন নাই"।

সেই কৃতাপরাধি ব্যক্তি, লোক পরম্পরায় কর্ত্তার এই সকল মিষ্ট ভর্ৎসনা অবগত হইয়া, বড়ই লজ্জিত হইল। সে ব্যক্তি কনিষ্ঠ রাধানাথ বাবুর মজলিসে সর্ব্বদাই উপস্থিত

থাকিত এবং তাঁহার প্রিয় পাত্রও ছিল। বড় মানুষদের পারিষদ মধ্যে সুলোক কুলোক থাকা নূতন পদ্ধতি নহে, সে মতে ইনিও সেই দলভুক্ত থাকায়, সময় বুঝিয়া রাধানাথ বাবুর কর্ণে দংশন করতঃ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের প্রতি বীতরাগ ও বীতশ্রদ্ধ করিলেন। ফলতঃ, ইহার দ্বারাই ভ্রাতৃভেদ ও মনোবাদ ঘটনার প্রথম সূত্রপাত হয়। মহেন্দ্রনাথ বাবু ক্রমে ক্রমে সেই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া এবং কনিষ্ঠ সহোদরের পূর্ব্বভাবের কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখিয়া চমকিত হইলেন। তখন যাহাতে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষাও কোন গুরুতর মনান্তর না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক হইবাব জন্য অগত্যা পৈতৃক চিহ্নিত জমিদারী ব্যতিরেকে উভয় সহোদরের এজমালের অর্জ্জিত যাবদীয় স্থাববাস্থাবর ভূসম্পত্তি যথাকালে ভাগবিভাগ দ্বাবায় পরস্পর হিস্যানামা লিখিত পড়িত করিয়া লইলেন। সে মতে ভদ্রাসন বাটীর যে যে ভাগ কৃতাংশ হইবার যোগ্য ছিল, তাহা বিভাগ হইয়া গেল। তদ্ভিন্ন সদরবাটী, পূজার দালান, ঠাকুরবাটী, সদাব্রতবাটী ও ভদ্রাসনের অন্তর্গত তলস্থ ভূমি, পুষ্করিণী, গড, এবং পশ্চিমের বিস্তৃত "রেল প্রাচীর" ও গেট, চিহ্নিত হইবার সুবিধা না হওয়ায় সমান অংশে এজমালে রহিল।

মহেন্দ্রনাথ বাবু বহুকষ্টের পর যদিও কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছিলেন, কিন্তু দুষ্ট লোকের কুচক্রে সে সুখ তাঁহার অদৃষ্টে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। তিনি ভ্রাতৃভেদে অসন্তুষ্ট ও মর্ম্মাহত হইয়া, সর্ব্বদাই মালিয়াজীর সম্মুখে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, যে "জগদীশ্বরের কি চমৎকার লীলা দেখুন।

আমি আজীবনকাল ভ্রাতৃকলহে উত্যক্ত হইয়া, আশৈশব নানা কষ্ট সহ্য করিয়া, পরিণামে কনিষ্ঠ সহোদরকে লইয়া সুখী হইব আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার বিডম্বনায় তাহাতেও বঞ্চিৎ হইলাম। কালে আমার লোকান্তে রাধানাথ যে আমার শিশু সন্তানগণকে লালনপালন দ্বারায মানুষ করিবে, অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধারণ লইবে, কিম্বা তাহার পুত্রগণের সহিত আমার এই অপোগণ্ড শিশুগণের সদ্ভাব থাকিবেক, এমত বুঝায় না। ঈশ্বরের লীলা মনুষ্যের বোধগম্য নহে। (যদ্বিধিব মনসস্থিতং) ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, ইহা আমি জানিয়াও মোহ বশতঃ একত্রে উভয় সহোদরে বসবাস করিয়া, এই মনোকষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি, নতুবা এরূপ মনান্তর ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না"।

কালের শীতল প্রলেপে সে ক্ষত হৃদয় না পুরিয়া উঠিতে উঠিতেই আর একটী অভাবনীয় দুর্ঘটনা তাঁহাকে দর্শন করিতে হইল। কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া সন ১২৩৪ সালে রাধানাথ বাবু অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়াও মহেন্দ্রনাথ বাবু ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বিষয় বৈভবের উন্নতি ব্যতীত কিছুই অবনতি পায় নাই। বরং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতষ্পুত্রগণকে আপন শিশুসন্তানগণের সহিত সমভাবে স্নেহ ও যত্ন সহকারে লালন পালন করিয়া, ধন সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি, ঘরবাটীর উজ্জলতা, দেবালয়, শিবালয়, অতিথশালা প্রভৃতির অঙ্গ সংস্করণ করিয়া, প্রভূত মঙ্গল বিধান করিয়া যান। তিনি জীবদ্দশায় স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ

ও ভ্রাতষ্পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ মহা সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়া যান। ঐ তিন বিবাহে অন্যূন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়, তাহা তিনি নিজ কোষ হইতে সরবরাহ করিয়াছিলেন। ভ্রাতষ্পুত্রগণকে সে ব্যয়ভার আদৌ বহন করিতে হয় নাই।

পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া, ১২৪০ সালের আষাঢ় মাহায, রথ পুনর্যাত্রা দিবসে, মহেন্দ্রনাথ বাবুর অকাল মৃত্যু হয়। সেই সন হইতে তাঁহাদের প্রধান জমিদারী "লাট মণ্ডল ঘাট" ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর ধুইহাজা অর্থাৎ জলপ্লাবিত হইয়া গো মনুষ্য বসতিশূন্য হয়। সেই হইতেই ইহাঁদের অবস্থান্তর ঘটনার সূত্রপাত হইল। ক্রমে উভয় সহোদরের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণেরা ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বিবাদে তাঁহাদের অস্থাবর সম্পত্তি যথা সোণা, রূপা, হিরা, পান্নার, অলঙ্কার ও বহুমূল্য তৈজসপত্র, সাল দোসালা, নগদ অর্থ সমুদয় নিঃশেষিত হইয়া যায়। সে বিবাদের আর কিছুতেই শান্তি হইল না। অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও ভ্রাতাগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, নরেন্দ্রনাথ তোষাখানায় প্রকৃতই অগ্নি সংলগ্ন করায়, সেই আগুনে তিন দিন তিন রাত্র জ্বলিয়া জ্বলিয়া সমুদয় ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই সুযোগে উভয় পক্ষীয় ধনলোলুপ আত্মীয় স্বজন এবং কর্তৃপক্ষগণ, ছলে বলে, কলে কৌশলে নাবালকগণের সর্ব্বনাশে সমুদ্যত হইলেন। এমন কি! যথাসময়ে মালগুজারির টাকা না দেওয়ায়, জমিদারীগুলি একে একে কালেক্টরির লাটে বিক্রয় হইতে লাগিল। তখন

সেই স্বার্থপর আত্মীয়গণ, প্রবঞ্চনা জাল বিস্তার করতঃ স্ব স্ব স্বার্থসাধন উদ্দেশে তাঁহাদেরই টাকায়, সেই সকল সম্পত্তি স্বনামে ও বেনামে খরিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, লিখিতে কি! যাহারা নাবালকগণের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই প্রায় স্ববংশে ধ্বংস হইয়াছে, অথবা যাহাদের বংশ আছে, তাহারা আজ সামান্য উদর পূরণার্থে অন্নের কাঙ্গালি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, কিম্বা যাহাদের বিষয় আছে, তাহাদের বংশাভাবে সেই ধনসম্পত্তি ভূত-ভোজন হইতেছে মাত্র।

যাহা হউক, সেই জ্ঞাতিবিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া "বাবু বংশাবলীর" মধ্যে একাল পর্য্যন্ত মনোমালিন্য অপসারিত হয় নাই। দুঃখীর প্রতি ধনীর অত্যাচার, দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের পরাক্রম, অক্ষমের প্রতি সক্ষমের প্রপীড়ন, এখনো হ্রাস পায় নাই। বরং নব নব বংশাবলীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দূরতা প্রযুক্ত শত্রুভাব উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা এখন কালের বশে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি স্বার্থ-পরতা পরতন্ত্র লইয়া, পরপীড়ন, পরস্বাপহরণ, এবং পরকে বঞ্চনা করিতে কেহই পরাঙ্মুখ নহে। ফলতঃ, যাহার সুখের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, হিতাহিত বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া, আজীবন পরস্পরের সর্ব্বনাশে ব্যস্ত, তাহাকেও যে একদিন দুরন্ত কালের গ্রাসে কবলিত হইতে হইবে, তাহার নাম পর্য্যন্ত এ জগৎ হইতে লোপ পাইবে, তাহা ভ্রমেও কাহারও মনে উদয় হয় না। তাহারা একমুহূর্ত্তের জন্যও

ভাবে না, যে সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎনিয়ন্তার চক্ষে অতি ক্ষুদ্র বালুকারেণু হইতে প্রশস্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সকলই সমান। অধুনা এই পর্য্যন্ত বক্তব্য যে, যে ভদ্রাসন মহেন্দ্রনাথ ও রাধানাথ উভয় সহোদরের এজমালের অর্থে অর্জ্জিত ও এজমালের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার যে যে ভাগ চিহ্নিতরূপে কৃতাংশ হয় নাই, সেই সকলের যথাযোগ্য অংশ প্রাপণে সেই মহেন্দ্রনাথ বাবুর ওয়ারিস পুত্র যে কেবল বঞ্চিত আছেন এমন নহে, তিনিও শৈশবকাল হইতে বার্দ্ধক্যদশায় আগত প্রায়, এই আজীবনকাল জ্ঞাতিপীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া কালযাপন করিতেছেন। সুতরাং দেখা যায়, যে জ্ঞাতিগণের মধ্যে কেহ নির্ধন হইলে, তাহার প্রতি ধনবানের অত্যাচারের আর অবধি থাকে না। এমন কি, যাহাতে সে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয়, তাহার জন্যও সময়ে সময়ে সতত পরস্ত চেষ্টার ক্রুটি হয় না। নির্ধনতা প্রযুক্ত দুর্ব্বল জ্ঞাতি যে কেবল পৈতৃক অবিভক্ত সম্পত্তির অংশ প্রাপণে নৈরাশ হয় এমত নহে, তাহার পাকশালার ধূম নির্গত হইতে দেখিলেও ধনবানের ঈর্ষানল প্রবল বেগে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। অপর কি, দিব্য বস্ত্র পরিধান, বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মান, এবং দাস দাসী লইয়া বসবাস করিতে দেখিলেও তাঁহাদের হিংসার আর পরিসীমা থাকে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, যে "জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং" তাহা অযথা বলিয়া বোধ হয় না। অতএব, জ্ঞাতি শৃঙ্খলে যাঁহারা জড়িত আছেন, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণে সাবধান হউন। অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনশীল গতিতে কখন কাহার কি দশা ঘটে, বলা যায় না। দুর্দ্দিন

ঘটিলে দুঃখী জ্ঞাতি, পৈতৃক ধনে বঞ্চিৎ হয়, অশেষ প্রকারে ক্লেশ পায়, ইহা চির প্রসিদ্ধ।

মহেন্দ্রনাথ বাবুর মৃত্যুর পর, তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতাগণ সকলেই জীবিত থাকিয়া এক এক জন দিক্‌পাল সদৃশ প্রতিভাশালী হওত কিছুদিন সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের বর্ত্তমানে সকলেরই অবস্থান্তর ঘটায়, আশ্রিত ও প্রতিপালিত জনগণের কষ্টের আর পরিসীমা রহিল না। যে ক্ষণজন্মা পুরুষের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি অর্জ্জিত হইয়াছিল, সেই মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হইতেই ঘরাও বিবাদ বিসম্বাদ উপলক্ষ করিয়া, দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যে সকলই ছন্ন ভন্ন হইয়া গেল। তাঁহারি সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গুরের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল।

উপসংহারে, আমরা রসিকলাল মালিরা মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মলিয়াজী মহাশয় সিঙ্গুর প্রদেশীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে অতীব ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারই পুণ্যফলে ত্বদীয় পুত্রবধু, বর্দ্ধমান জীলার অন্তর্গত সেহাড়শোল গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের কন্যা শ্রীশ্রীমতী হর সুন্দরী দেবী, পিতৃধনে উত্তরাধিকারিণী হইয়া, বদান্যতাগুণে ইহসংসারে সমুচিত প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে "মহারাণী" উপাধি লব্ধ করিয়া মালিয়াকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র (রসিকলালের পৌত্র) স্বর্গীয় রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়া, অশেষ সদ্‌গুণালঙ্কৃত

ছিলেন; কিন্তু, দুঃখের বিষয় যে নৃশংস কাল অকালেই তাঁহাকে কালগ্রাসে কবলিত করেন। অপর দুই জন কুমার রামেশ্বর মালিয়া ও কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া মহোদয়গণ, সেহাড়-শোলে বিরাজমান থাকিয়া মালিয়া বংশের গৌরব সংরক্ষণ ও বহুবিধ সদনুষ্ঠানে রত আছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"My country! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last.
And grovelling in the lowly dust art thou;
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery!
Well—let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country! one kind wish for thee!"

(H. L. V. Derozio.)

হায় সিন্ধুর! সত্যের অনুরোধে আজ তোমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়,

হস্ত হইতে লেখনি স্খলিত হইয়া পড়ে। যে "বাবুবংশাবলীর" বিপুল বিক্রমে, কথায় বলে, "বাঘে গরুতে একত্রে জলপান করিত", তাঁহাদের সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এখন কোথায়? কেন তাঁহারা আজ নিস্তেজ, নিষ্প্রভ এবং নিঃস্ব? যাঁহাদের অদ্ভুত কার্য্যকলাপের বিষয় শুনিয়া, একদিন ভারতবাসী মাত্রেই স্তম্ভিত হইয়া থাকিত, সেই বংশের আজ এ দুর্দ্দশা কেন? সে অতুলিত ধনরত্ন কোথায় গেল? অনন্ত ঐশ্বর্য্য-রাশি কে অপহরণ করিল? তাঁহাদের উপস্থিত দুরাবস্থার কথা শুনিলে, এখন কাহার হৃদয় না ব্যথিত হয়?

হায় সিঙ্গুর। তুমি যাঁহাদের রূপের ছায়ায় আপনাকে রূপসী বলিয়া গর্ব্ব করিতে, যাঁহাদের কীর্ত্তিভাতি বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাকে অহঙ্কৃত বলিয়া জ্ঞান করিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী পুরুষেরা কোথায়? যাঁহাদের বদান্যতা গুণে বিভূষিতা হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া ভাবিতে, সে সকল সুসন্তানেরা কোথায় গেল? আজ লিখিতে লজ্জা করে, যে দেবালয়ে কতশত আহুত, অনাহুত, ররাহুত অতিথিগণ পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিত—সেই দেবালয় এক্ষণে বিহার ভবন হইয়াছে। বিগ্রহ রাধা-গোবিন্দজীউ গলগ্রহ বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার সেই পূর্ব্ব বেশ ভূষা, পূর্ব্ব ভোগরাগের পরিবর্ত্তে উপস্থিত দৈন্যভাব দর্শন করিলে, কোন্ ভক্ত হৃদয় না দ্রবীভূত হয়? যে শিবালয়, নিত্য সমাগত অতিথি ও সন্ন্যাসীগণের গাল-বাদ্যে নিয়তই প্রতিধ্বনিত হইত—তাহাই আবার আজ অরণ্যানী বেষ্টিত হইয়া পূজকগণকে ভীতি প্রদর্শন করি-

তেছে। যে পুষ্পোদ্যানের রমণীয় শোভা, একদিন মানব মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ কবিতে সমর্থ হইত, সেই পুষ্পোদ্যান আজ লতা কণ্টকাদিতে পবিপূর্ণ হইয়া শিবাগণের আশ্রয়-স্থল হইয়াছে। যে পূজাব দালানের অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশল এবং আশ্চর্য্য কারুকার্য্য দেখিতে, কত দেশ দেশান্তব হইতে কত লোক সমাগম হইত, আজ তাহাব চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইযাছে। কেবল ইষ্টকবাশিব উপব ইষ্টকবাশি স্তবে স্তরে বিন্যস্ত থাকিয়া, ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুল্লতার ন্যায সৌভাগ্য লক্ষ্মীর চঞ্চলতা দেখাইয়া দিতেছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে সিঙ্গুব যথার্থই সুবর্ণপুরী ছিল, সে সিঙ্গুব এক্ষণে শ্রীহীনা হইয়াছে।

বিস্তৃত প্রাসাদরাজীর ভগ্নকঙ্কালস্তূপ এক্ষণে বনচর ও বিষধর গণের আবাসভূমি হইয়াছে। সুবম্য হর্ম্ম্যাবলীর আর মাধুরী নাই, প্রমদ কাননেব আব রমণীয়তা লক্ষিত হয় না। সরোববেব স্বচ্ছ বারিরাশিও যেন তাঁহাদেব অবর্ত্তমানে দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে। সম্মুখে সুবিস্তৃত গড়বাটীর সুদীর্ঘ "সিংহ দ্বার"—কাল প্রভাবে ক্ষত বিক্ষত কলেবরে ভীষণাকাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বত্থ, বট এবং কতিপয় মাত্র অন্য বন্য পাদপনিচয়, যেন তাহাব উপরিভাগ হইতে প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। সে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। বিপুল বিষয় বৈভবও কাল প্রভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেবল স্মৃতি মাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, অপরিণামদর্শী মহেন্দ্র-নাথেব অভ্রভেদী অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ যেন আজিও নীরবে নির্ম্মাতাব জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সিঙ্গুরের আর সে শ্রী নাই, সে গৌরব নাই, সে রূপমাধুরীও যেন অনন্ত কাল-

সাগরে মিশাইয়া গিয়াছে। জগৎনিয়ন্তার এই অদ্ভুত বিশ্ব-রহস্য ভেদ করে কার সাধ্য? আজ যাহা জনমানবশূন্য বালুকাময় মরুভূমি, কালে তাহা অসংখ্য হর্ম্মবাজী সুশোভিত রাজধানী। আজ যিনি দীন দুঃখী, মুষ্টি ভিক্ষুক, কাল তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজরাজেশ্বর। আজ যিনি পর্ণকুটীর-বাসিনী কাঙ্গালিনী, কাল কিম্বা দশদিন পরে হয়তো তিনিই আবার উচ্চপ্রাসাদ বিহারিণী ইন্দ্রাণী হইবেন। ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? তাই নিয়তি চক্রের পরিবর্ত্তনে উন্নতির পর অবনতি এবং অবনতির পর উন্নতি সহকারে মানব তাহার অদৃষ্টফল ভোগ করিতে করিতে আপনাপন গন্তব্যপথে ধাবিত হইতেছে। পরিবর্ত্তনশীল কাল, এই নশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অসারতা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।

আজ ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত তর তর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। বাহ্যাড়ম্বর, বাহ্য সম্পদ, বাহ্যিক ঘনঘটায় দিগ্‌মণ্ডল ব্যাপৃত করিয়াছে। একদিকে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পুলিষ, পোষ্টাপিস, স্কুল, ডাক্তারখানা, অপর দিকে হরি সভা, ভারত সভা, সর্ব্ব সম্মিলনী সভা প্রভৃতি সারি সারি পর্য্যবেশীত থাকিয়া অশেষবিধ উন্নতি সাধন এবং নূতনতর শ্রীধারণ করিয়াছে। কিন্তু এ সকলে দেশের লোকের কতটুকু ইষ্ট সাধিত হইতেছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয়জন লোক ভারত মাতার দুঃখ অপনোদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে? কয়জন লোকের হৃদয়তন্ত্রী একই তারে অনস্যূত হইয়া একই

উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে? এখন ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যেন নূতন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। নূতন বেশভূষায় ভূষিত হইয়া সকলেই বাহ্যাডম্বরের পূজা করিতেছে। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তনের সময়, হায় সিঙ্গুর! তোমার আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে লজ্জা, ক্ষোভ, অভিমান আসিয়া যুগপৎ হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। তোমার পূর্ব্ব সুখ, পূর্ব্ব সমৃদ্ধি স্মরণ হয়। পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সহিত ইদানিন্তন শ্মশানভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়। হা অভাগিনী! হা চির দুঃখিনী!! তোমার সে রূপ, সে লাবণ্য আজ কোথায় গেল? সে সুষমা সৌন্দর্য্যরাশি কে হরণ করিল? যে উজ্জ্বল আলোকে একদিন বঙ্গভূমি বিভাসিত করিয়াছিলে, সে আলোক আজ কোথায়? আর কি কেহ তাহা দেখিতে পাইবে না? আর কি কখন তোমার ভালে সুখসূর্য্য উদয় হইবে না? নিয়তিচক্র কি চিরকালই অপরিবর্ত্তিত থাকিবে? চিরকালই কি কাল শনৈশ্চর তোমার সৌভাগ্য পথের গতি রোধ করিবে?

সম্পূর্ণ।